দার্জিলিং-সঙ্গী

হিমানীশ গোস্বামী

মনোমোহন প্রকাশনী ● কলিকাতা

প্রকাশক :

প্রবীর ভট্টাচার্য

মনোমোহন প্রকাশনী

৫৪/৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন—১৩৫৮

প্রচ্ছদ : শান্তনু ভট্টাচার্য

স্কেচ : অমল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :

জি. শীল

ইম্প্রেসন প্রবলেম

২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৫

উৎসর্গ

এণাক্ষী গোস্বামীর

করকমলে

দার্জিলিং-এর নাম আমার ছোটবেলা থেকেই শোনা। জায়গাটা যে আশ্চর্য সব দৃশ্যে ভরা তা গ্রামে থেকে কখনও পাহাড় না দেখেই নানা আলোচনা থেকে, কিছু বইতে পড়ে এবং বাকিটা কল্পনার সাহায্যে একরকম বুঝে নিয়েছিলাম। বাবার (পরিমল গোস্বামী) কাছে মাঝে মাঝেই আমরা দার্জিলিং-এর কথা শুনেছি—এবং তিনি খুব বাছ বিচার করে কথা বলতেন, এবং কখনও কোনো বিষয়ে উচ্ছসিত হতে তিনি পারতেন না, কেবল তিনটি বিষয় ছাড়া। এই তিনটি বিষয় হল তাঁর পিতা বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং দার্জিলিং। প্রথম দুটি বিষয় এখন বাদ দেওয়া গেল। দার্জিলিং সম্পর্কে তিনি যখন বলতেন তখন হঠাৎ তাঁর স্বাভাবিক সমালোচনা প্রিয়তা কর্পূরের মত উঠে যেত। তিনি নরম হয়ে বলতেন, দার্জিলিং একটা আশ্চর্য এবং অসম্ভব ব্যাপার। ওর বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য তাঁর নেই। তবে সাধ্য না থাকলেও যথেষ্ট চেষ্টা করতেন তিনি—এবং কেউ কোথাও ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাইলে তিনি বলতেন, একবার দার্জিলিংটা ঘুরে এসো। বেশ ছোটবেলায়, তিনি দার্জিলিং-এ গিয়েছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে। সে অনেক দিনের কথা—১৯১৩ সাল, আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। সে সময় দার্জিলিং-এর চেহারা কেমন ছিল আমার জানা নেই—কিন্তু দার্জিলিং এর উত্তরের আশ্চর্য সব পর্বত শিখর, ঝক ঝকে সকালের রোদ্দুরে যা স্বর্ণ বর্ণ এবং প্রতি মুহূর্তে যার রঙ আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলে বদলে যায়, শান্ত পাইন গাছের ভেতর দিয়ে যার চেহারা আজও দেখা যায়, তার কোনরকম

পরিবর্তন হয়নি। প্রায় সত্তর বছর আগেও সে দৃশ্য যেমন আশ্চর্য ছিল, আজও তেমনি আছে, এবং গুরুতর কোনো কিছু না ঘটলে আরও সত্তর বছর এরকমই থাকবে।

আরও একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। সত্তর বছর নয়—সত্তর হাজার বছর। এবং এই সঙ্গে আরও একটু এগুনো যাক—সেদিকেও সত্তর হাজার বছর ধরে নেওয়া যাক। খুব যে একটা পরিবর্তিত অবস্থা ছিল সত্তর হাজার বছর আগে তা মনে হয়না। আর আগামী সত্তর হাজার বছরেও হিমালয় হিমালয়ই থাকবে, হিমালয়ের অন্তত উপরের মহলে কোনো পরিবর্তন বিশেষ হবে বলে মনে হয়না। তখনও থাকবে এই দার্জিলিং বলে জায়গাটি—কিংবা হয়ত ধ্বসে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে চুরে শেষ হয়ে যাবে, এখানে মানুষ হয়ত আর থাকতে পারবেনা। কিন্তু সামনের ঐ যে পর্বত শিখরগুলি, ওরা নিশ্চয় ঠিক ঐ ভাবেই থাকবে মাথা উঁচু করে। ঠাণ্ডা মাথায় পর্বত শিখরগুলি তাকিয়ে দেখবে মানুষের পরিবর্তন, মানুষের হাসি, খেলা, দুঃখ এবং মৃত্যু। মহাকালের মত হিমালয় পর্বত থাকবে ১৫০০ মাইল জুড়ে ভারতবর্ষের উত্তরে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে। এই হিমালয়কে কালিদাস বর্ণনা করেছিলেন এভাবে:

> আছে উত্তর দিশি দেবাত্মা ধরিয়া
> হিমালয় নামে ওগো সারা নগ সেরা যে,
> পূব পশ্চিম ভিতে পয়োধিতে পড়িয়া
> পৃথ্বী মাপারি যেন দাঁড়ি হেন সে রাজে।

কুমার-সম্ভব অনুবাদ করেছিলেন আমরা ঠাকুর্দা বিহারীলাল। বিহারীলাল মারা যান ১৯৩১ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যু সংবাদ পান দার্জিলিং-এ থাকার সময়। তিনি বাবার কাছে একটা চিঠি লেখেন। ঐ সময় আমি খুবই ছোট। কিন্তু বাড়িতে তখন প্রায়ই ঐ কথা নিয়ে আলোচনা হত বলে আমার যেন মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের নাম তার আগেই আমি নিশ্চয় শুনেছিলাম, কিন্তু দার্জিলিং এর নাম ঐ আমার প্রথম শোনা। নামটা অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল, এবং আমার মনে আছে আমরা কয়েকজন শিশু বিনা কারণেই দার্জিলিং—দার্জিলিং বলে চিৎকার করে অসম্ভব এক আনন্দ পেতাম। দার্জিলিং যে কি, কোথায়, কেন এসবের

কোন কিছুই আমাদের ধারণায় ছিলনা। বড়দের কেউ সে ধারণা দিতেও চাননি, কিন্তু বহুদিন আমার মনে মাঝে মাঝেই দার্জিলিং কথাটি এসে উদয় হত— এবং আমি গুণ গুণ করে আপনমনে দার্জিলিং—দার্জিলিং উচ্চারণ করতাম। কুমারসম্ভবে হিমালয়ের বর্ণনা আরও আছে :

যাঁরে বাছুরের মত ধরি' যত পাহাড়ে—
দোহন কুশল মেরু দোহাল সে হইল,
কত-না মহৌষধি, রতনো কি বাহা রে,
পৃথু-মতে ক্ষিতি হ'তে দুহিয়া যে লইল।

অগণিত মণি নিত' খনি যাঁর বিতরে,
হিমানীতে কি হানিতে পারে তাঁর সুষমা ?
এক্-ই দোষ ডুবে' যায় শত গুণ ভিতরে
ষোলকলা শশি-কোলে কলঙ্ক উপমা।

হিমালয় এমন বিরাট—এমন রহস্যময় যে তার বর্ণনা দেওয়া কারুরই সাধ্য নয়। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে করতে পারেননি। সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হলে হিমালয়ের রহস্য ভেদ হয়ে যেত, কিন্তু আমরা তা চাইনা। প্রকৃতির সব রহস্য জানার কোনো দরকার নেই। মানুষকে আশ্চর্য হতেই হবে, যেদিন মানুষ আশ্চর্য হবার অধিকার বা ক্ষমতা হারাবে, সেদিন মানুষ হয়ে পড়বে একটা গন্তময় জন্তু। বিস্ময়ই মানুষকে সহজ করেছে। কালিদাসের হিমালয় আরও একটু দেখা যাক :—

সিন্দুরে গৌরীকে কিন্নরী ললনা
বিভ্রম ভূষা করি বিহরিছে শিখরে,
ধাতু-আভা লেগে' যবে মেঘে শোভে ছলনা
অকাল সাঁঝের মত পর্বত উপরে।

সমুদ্র থেকে হয় মেঘ। হাওয়ায় মেঘ চলে উত্তর দিকে। বাধা পায়—মেঘ হিমালয়কে ঢেকে ফেলে। বৃষ্টি নামে। পাহাড়ের গা বেয়ে জল নামে।

তরুণ পর্বত হিমালয়

হিমালয় পর্বত তরুণতম পর্বতগুলির অন্যতম। তরুণতম হলেও এর বিশালতা এবং উচ্চতার তুলনা নেই। আবার এটাও বলা প্রয়োজন হিমালয় তরুণতম হলেও মানুষের পৃথিবীতে আগমন যে যুগে শুরু হয়েছিল তার তুলনায় হিমালয়কে বেশ প্রাচীনই বলতে হয়। ভূতাত্ত্বিকেরা হিসেব কষে বার করেছেন হিমালয়ের প্রাচীনতম পাথরের বয়স আনুমানিক ১২০ কোটি বছর। ভূতাত্ত্বিকেরা বলছেন এর চাইতেও প্রাচীন পাথর হিমালয়ে হয়ত রয়েছে কিন্তু তাদের বয়সের হিসেব করা এখনও বাকি রয়েছে। আমাদের অত সূক্ষ্ম হিসেবের প্রয়োজন নেই। হিমালয় পৃথিবীর অন্যান্য পর্বত শ্রেণীর তুলনায় যত তরুণই হক না কেন আমাদের কাছে এ মহাপ্রাচীন ও আশ্চর্য ব্যাপার। এই হিমালয় সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র বলেছেন ঃ

হিমালয় মহীধর ভীম কলেবর,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত উত্তর ;
তুষার মণ্ডিত শ্বেত শিখর নিকর,

ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অম্বুদ অম্বর—
ধবল ধবল গিরি উচ্চ অতিশয়,
করিতেছে সুধা পান চন্দ্রমা আলয়,
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর,
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর,
শীত ঋত দেবধান শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম,
ধরিয়াছে তাপ আশে অরুণ অগম।
নদ নদী হ্রদ উৎস সলিল প্রপাত,
শোভা করে শৈল বরে সব শৈল জাত,
পৃথিবী পিপাসা-নাশা জল ছত্র জ্ঞান,
অকাতরে গিরিবর করে নীর দান,
অবনীর নীর প্রয়োজন অনুসারে
ভূরি ভূরি বারি ভরা ভূধর ভাণ্ডারে। (১)

দু-হাজার চারশো কিলোমিটার উঁচু পাথরের দেওয়াল। চওড়াও কম নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি যে প্রাকৃতিক বিষয়টি প্রভাবিত করেছে তা হল এই হিমালয়। পৃথিবীর আর কোনো দেশের পর্বতমালা এমন ভাবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করেনি। হিন্দুদের কাছে হিমালয় কেবল যে বরফ মণ্ডিত দুর্গম ঠাণ্ডার রাজ্য তা নয়, এখানে দেবতারাও বাস করেন। আর সে দেবতা গ্রীকদের অলিমপাস পর্বতের দেবতার মত সহজ লভ্য নয়, শিবঠাকুরের আপন দেশ হিমালয় বড়ই দুর্গম। (২) এই হিমালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পবিত্র স্থান। তীর্থ যাত্রীরা বছর বছর সে সব জায়গায় যাওয়ার জন্য, একবার দেব দর্শন পাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। জায়গাগুলির নাম আমাদের কাছে কতই না পরিচিত—কেদারনাথ, বদরিনাথ, পশুপতিনাথ, অমরনাথ। আরও অনেক নাম। আর রয়েছে আধুনিক কিছু শৈল শহর—সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য

(১) সুরধুনী কাব্য—দীনবন্ধু মিত্র
(২) সর্দার পানিকর

সিমলা, শিলং ডালহৌসি নৈনিতাল, এবং দার্জিলিং। এ সব শহরে তীর্থযাত্রীরা যাননা, তবে প্রতি বছর হাওয়া বদলানর জন্য মানুষের ভীড়ের কমতি নেই। শৈল শহরগুলির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, তার নাম দার্জিলিং।

এই দার্জিলিং এর কথা নিয়েই এই আলোচনা। তবে স্বাভাবিক ভাবেই এর সঙ্গে আসবে সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয়। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর নাম তাই উচ্চারিত হবে একাধিকবার।

ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন, হিমালয় সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর স্তরে বিরাট তোলপাড়, ভাঙাচোরার ফলে। আবার এটাও প্রমাণিত হিমালয়ের কিছু অংশ মাথা চাড়া দিয়ে আকাশের দিকে উঠবার আগে ছিল সমুদ্রের তলায়। সম্প্রতি(৮) প্রথম হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট বিজয়ী হিলারী একটি অভিযান করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এটি ছিল গঙ্গার মুখ থেকে নৌকো বেয়ে গঙ্গার উৎসে পৌছানো। এর নাম দেওয়া হয়েছিল সমুদ্র থেকে আকাশ। নামটা ভাল। হিমালয়ের জন্ম সম্পর্কেও এই নামটার মিল রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যাঁকে আমরা ডি এল রায় বলতে ভালবাসি, লিখেছিলেন—যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল মা জননী ভারতবর্ষ, তখন তিনি ভূতাত্ত্বিক সত্যকেই প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই একদা দার্জিলিং থেকে এই বিরাট হিমালয় সম্পর্কে তাঁর অনবদ্য ভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন :

কে তুমি সহস্র যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হতে তাতার,
অক্ষয় হীরক মুকুটের মত ভারতলক্ষ্মীর মাথার,
জ্বলিছে প্রদীপ্ত, পাইয়া উষার কনকচরণ পরশ
তুষার মণ্ডিত চূড়ায় ? হিমাদ্রি ? ব্যাপি কত লক্ষ বরষ
আছ এই রূপ নিশ্চল, নিস্তব্ধ, ভেদিয়া নির্মল গগন
উতুঙ্গ শিখরে, গিরিবর ? আছ, কোন মহাধ্যানে মগন,
মহর্ষি ··

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন হিমালয় নিশ্চল, নিস্তব্ধ। তবে একথা ভূতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করেন না। হিমালয় এখনও বাড়তির দিকে। হিমালয় এখনও তরুণ।

তবে তা ক্ষণিক-জীবন মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে সম্ভবত ল্যাবোরেটরির সূক্ষ্ম যন্ত্রে। কিন্তু কবির সে সব প্রয়োজন হয় না। ভারতকে ভালবেসে সে কবি বলতে পারেন, এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র···। তিনি বলতে পারেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি···।

হিমালয়ের দেয়ালে বাধা পেয়ে বহু আক্রমনকারী ফিরে গেছে। বিশাল পর্বত মানুষের বন্ধু নয়, বন্ধুর। সমতল ভূমি ছেড়ে মানুষ সহজে পর্বতে বসবাস করতে নিশ্চয় যায়নি। পর্বতে অনেক গাছ, অনেক লতা, অনেক জঙ্গল—কিন্তু পাথুরে জায়গায় চাষ করা অতি কঠিন। চলতে গেলে পদে পদে বাধা। উঁচু এবং নিচু—চলতে গেলে এই দুটোই পথ, সমতল পথ প্রায় নেই, আসলে পর্বতের গায়ে পথই নেই। কয়েকশো মাইল পর্বতের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা খুব সহজসাধ্য নয়। তিব্বতের পথে স্বেনহেদিন তাঁর দলবল সমেত ৪৯ দিন হেঁটে একজন মানুষের মুখও দেখতে পাননি, এরকম কথা লিখে গেছেন। পর্বতের পক্ষে ওটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ অন্য ধাতুতে গড়া। কোনো মানুষ যেমন সহজ ভাবে জীবন যাপনেই আগ্রহী, তেমনি কোনো কোনো মানুষ আবার জোর করেই বিপদের পথে পা বাড়ায়, ঝুঁকি নেয়। প্রাচীন কালের মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় তারা নদীর ধারের সমতল ক্ষেত্রকেই বেছে নিয়েছিল, এবং মোটামুটি নিশ্চিন্তে বাস করেছিল প্রতি বছর নদীর পলিমাটিতে ফসল ফলিয়ে, এখানে ওখানে শিকার করে। কিন্তু তবু কেন তাদেরই কেউ কেউ আবার ঢুকে পড়ল জঙ্গলে ভরা পাহাড় পর্বতে? সে সব ইতিহাস কেউ লিখে রাখেনি, যদিও এটা অনুমান করা যায় মানুষ সর্বদাই কিছু না কিছু ভাবে অন্য মানুষের উপর কতৃত্ব ফলিয়েছে, প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং গোষ্ঠী লড়াইতে মেতেছে। এই গোষ্ঠী লড়াইএর পরিণতিতেই হয়ত মানুষকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল পাহাড়ে, পর্বতে। এভাবে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তারা, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়েছিল পর্বতের স্বাভাবিক বাসিন্দা। কিন্তু পুরণো কালেও যেমন, এখনও পর্বতে বাস করা খুব একটা আরামদায়ক নয়—বিশেষ করে যাদের বাঁচতে হলে করতে হয় দৈহিক পরিশ্রম। সমতল ক্ষেত্রে যারা দৈহিক পরিশ্রম করে তাদের কাজও যে খুব আরামদায়ক তা নয়, কিন্তু এটা ঠিকই, পঁচিশ কেজি বোঝা

নিয়ে সমতল ক্ষেত্রে এক কিলোমিটার পথ যেতে যতখানি পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় পাহাড়ী জায়গায় প্রয়োজন হয় তার চাইতে অনেক বেশি পরিশ্রমের।

আগে যে হিমালয় ছিল সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য, মানুষ পর্বতে বসতি স্থাপন আরম্ভ করার পর দেখা গেল দেওয়ালে পিঁপড়ের গর্তের মত চলাচলের ব্যবস্থা কিছু হয়ে গেছে। স্বেন হেদিন এই শতাব্দীতেই ৪৯ দিন চলার পরও তিব্বতে একটিও মানুষের দেখা পাননি—(এর সঙ্গে সমুদ্রপথে কলম্বাসের 'ভারত' অভিযানের তুলনা তুলনা করা যায়), কিন্তু এখন পৃথিবীতে মানুষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতের মত জনবিরল রাজ্যেও মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের আশ্চর্য বাহন জিপ। বিমান হেলিকপ্টারের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। আজকের দিনে নেহাত বরফ মণ্ডিত অঞ্চল ছাড়া হিমালয়ের অন্য কোথাও উনপঞ্চাশ দিন চললে মানুষের দেখা মিলবে না বলে মনে হয় না। পর্বতাঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা আবার সে সব অঞ্চলে থাকতে থাকতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে তাঁদের সমতল জায়গায় মন বসেনা। শারীরিক ভাবেও সমতল ক্ষেত্রে থাকতে তাদের অসুবিধে হয়। এর দুটি কারণ—প্রথমটি হল উঁচু জায়গায় হাওয়ার চাপ কম হওয়ায় এবং ঐ ভাবে থাকতে অভ্যস্ত হওয়ায় সমতল জায়গায় এলে অসুবিধে হয়। ঠিক ঐ একই কারণে উঁচু জায়গায় চটপট উঠে গেলে সমতল' ভূমির লোকেদের অসুবিধে হয়। আর একটি কারণ হল মানুষের পায়ের পেশী। সমতল ভূমিতে মানুষের পায়ের পাতা থাকে দেহের সঙ্গে নব্বই ডিগরি কোণ করে, আর পাহাড়ী অঞ্চলে চলাচলের সময় নব্বই ডিগ্রীর কোণ ব্যতিক্রম। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে শিলং থেকে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক কলকাতায় এসেছিলেন বেড়াতে। পাহাড় অঞ্চলের লোকেরা প্রচুর হাঁটতে পারে মনে করে তাঁকে নিয়ে কার্জন পার্ক থেকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর দিকে হাটছিলাম রেড রোড ধরে। এক কিলোমিটারও হয়নি, হঠাৎ তিনি বললেন, একটা ট্যাকসি নিলে হয় না? আমি বললাম, কী হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাকি? আমি আশা করেছিলাম এর উত্তরে তিনি বলবেন, না। পায়ের মাস্‌লে বড় লাগছে। পায়ের মাস্‌লে লাগার কারণ তখনই আমার ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয়নি, আমার তখন মনে হয়েছিল হয়ত আগে তাঁর পায়ে আঘাত টাঘাত লেগেছিল হাঁটতে গিয়ে সেখানে

লাগছে। পরে জেনেছি পাহাড়ী লোকেদের পায়ের পেশী চলার সময় যে ভাবে অভ্যস্ত সমতল ভূমিতে তা-ত অস্বাভাবিক, এবং সেই কারণেই তাঁর অসুবিধে হচ্ছিল!

পর্বতে যারা বসবাস করে তাদের সমতলভূমিতে এসে থাকতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়, আবার ঠিক এর উলটোটাও সত্য। পর্বতে মানুষ সহজে যেতে চায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে সর্বদাই ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া যায়। সমতলের দু এক জন মানুষ পাহাড পর্বত ডিঙোতে চায়। সমতলের মানুষ পাহাড পর্বত দেখে মুগ্ধ হয়, ভালবাসে। তারপর জয় করতে চায়।

বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে।
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ
ভালোবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে তো দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার। (৪)

মানুষ আঁখ মেলে চারিদিকে ভ্রমণ করতে চায়। পাহাড পর্বত নদী নালা বান ক্ষেত দোয়েল পাখি বাঘ হাতি প্রজাপতি কিছুই তার চোখ এড়ায় না। তবে পর্বত মানুষকে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি টানে। আমরা বাঙলার মানুষ - পর্বত দূরের কথা, ছোট পাহাড়ই আমাদের সহজে দেখা হয়ে ওঠে না। উত্তরবঙ্গের মানুষ অবশ্যই হিমালয়ের কিছুটা দেখতে পায়, এবং দার্জিলিং এর অনেকে তো পর্বতে বাসই করে থাকে। কিন্তু পর্বতে যারা বাস করে তাদের মধ্যে বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা কম। তাই আমি এখানে যে বাঙালীর কথা বলছি সে হল সমতল ভূমির বাঙালীর কথা। এই সমতলভূমির বাঙালী ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হিমালয় নয়, তিনি পালমৌ-এর সামান্য পাহাড় দেখা প্রসঙ্গে লিখেছেন—বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস। মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়।

অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাডগুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য কি? বাল্যকালে পাহাড় পর্বতের পরিচয় অনেক শুনা

(৪) রবীন্দ্রনাথ: প্রকৃতির প্রতিশোধ

ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চুনকাম করা এক গিরি গোবর্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। কৃষক-কন্যারা শুদ্ধ গোময় সংগ্রহ করিয়া যে স্তূপ করে, বৈরাগীর গোবর্ধন তাহা অপেক্ষা কিছু বড়।...(৫)

১৮৫২ সালে ভারত সরকারের জরীপ বিভাগ 'মাউনট এভারেস্ট' গিরিশৃঙ্গটি আবিষ্কার করে। ১৮৬০ সালে এর উচ্চতা হিসেব কষে বার করা হয়—২৯০০২ ফুট। (৬) এই শৃঙ্গটির অস্তিত্ব এর আগে তিব্বতীরাও জানতেন না বলে একজন মত প্রকাশ করেছেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন 'এভারেস্ট' এর যে সব নাম আগে ছিল বলে জানা যায় সেগুলির কোনটিই এভারেস্ট ছিল না! তিব্বতী নাম স্থমু লানচমা সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি মাউনট এভারেস্ট থেকে ষাট মাইল দাক্ষণে স্থন কোশি এবং অরুণ নদীর মাঝখানে অবস্থিত, অতএব এটিকে 'এভারেস্ট' বলা চলে না। ভারতের জরীপ বিভাগ এভারেস্টের একটা চিহ্ন দেন সেটি হল XV, অর্থাৎ তখনও এর স্থানীয় নাম কিছু জানা যায়নি। স্থানীয় কোন নাম থাকলে তা নিশ্চয়ই দেওয়া হত। হজসন এর নাম দিয়েছিলেন দেবধুঙ্গ, এবং শ্লাজিনটওয়াইট নাম দিয়েছিলেন গৌরীশংকর—কিন্তু পরে দেখা যায় এ দুটোই ভুল নাম। এখানে উল্লেখযোগ্য, এখনও স্কুলপাঠ্য বাংলা বইতে এভারেস্টকে গৌরীশংকর বলে উল্লেখিত হয়। এটি একেবারেই ভুল। ১৯৩২ এর হিমালয়ান জারনালের ৪র্থ খণ্ডে এভারেস্টের স্থানীয় নাম নিয়ে বেশ খানিক আলোচনা করা হয়েছে। তাতে নিবন্ধকার স্পষ্টই প্রমান করেছেন 'এভারেস্ট' এর কোন স্থানীয় নাম ছিল না, অতএব 'মাউনট এভারেস্ট' নামটিই একমাত্র নাম এবং বিনা দ্বিধায় ঐ নামকেই গ্রহণ করা উচিত। এ পর্যন্ত ঐ নামটিই চলে এসেছে স্বেন হেদিন সহ তৎকালীন নানা ব্যক্তির আপত্তি সত্বেও। আমরাও এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ নামেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটিকে অভিহিত করব। এভারেস্ট যে জরীপ বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন, সেই জরীপ বিভাগেই কাজ করতেন এক-জন বাঙালী, তাঁর নাম রাধানাথ শিকদার। কেউ কেউ বলেন আসলে রাধানাথই

(৫) পালামৌ

(৬) বর্তমান উচ্চতা ২৯০২৮ ফুট

প্রথমে 'এভারেস্ট' শৃঙ্গটির হদিশ পান কিন্তু কর্তার নামেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়াটির নামকরণ হয়।

যাই হক, ডাঙার উপরকার পর্বতশৃঙ্গগুলির মধ্যে একেবারে সমুদ্রের তলা থেকে জল ভেদ করে উঠেছে 'মাউনা কি' পর্বত। এর মাথাটা রয়েছে সমুদ্রের ১৩,৭৯৬ ফুট উপরে। সমুদ্রপীঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৩,৪৭৬ ফুট। আমরা সমুদ্রের গভীরে পর্বতের কতখানি রয়েছে সে হিসেব করে এভারেস্টকে খাটো করতে চাই না। ওরকম হিসেব করতে হলে হিমালয়ও সমুদ্র সমতল থেকে কতখানি তলায় রয়েছে সেটাও হিসেবের মধ্যে আনতে হয়। তবে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরগুলির সংখ্যা যে কত বেশি তার একটা হিসেব দেখলেই এর বিরাটত্ব বোঝা যাবে। পৃথিবীতে ২৪ হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতা রয়েছে এমন শিখরের সংখ্যা ১০৮টি, এগুলির মধ্যে হিমালয়—কারাকোরমেই রয়েছে ৯৬টি, বাকি বারোটি রয়েছে পৃথিবীর অন্যত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মালভূমি রয়েছে হিমালয় সন্নিহিত তিব্বতে। এর গড় উচ্চতা হল ১৭ হাজার ফুট।(৭) এর সঙ্গে তুলনা করা যাক বৃটেনের বেন নেভিস পর্বতশৃঙ্গ। তার উচ্চতা ৪৪০৬ ফুট।

এভারেস্টের তুলনা হয়না। ১৯২১ সালে এই এভারেস্ট জয় করার জন্য প্রথম পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হয়। তারপর কতকগুলি অভিযানে ১১ জনের প্রাণহানির পর অবশেষে ১৯৫৩ সালের ২৯ মে হিলারি এবং তেনজিং সকাল সাড়ে এগারোটার সময় এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠেন। তারপর থেকে ১৯৭৩ এর ২৬শে অকটোবর পর্যন্ত কুড়ি বছরে এই শৃঙ্গ ১৫ বার জয় করা হয়। ১৯৬৫ এর অভিযানে ভারতীয় দল ২০মে, ২২মে, ২৪মে এবং ২৯মে—এই চারবার এভারেস্ট আরোহন করেন।

খোদ দার্জিলিং শহর থেকে এভারেস্ট দেখা যায় না—কিন্তু দার্জিলিং এর কাছেই টাইগার হিল থেকে এই শৃঙ্গ দেখা যায় যদি কুয়াশা না থাকে।

দার্জিলিং এর অবজারভেটরি হিল থেকে যে সব চূড়া পরিষ্কার আবহাওয়ায় দেখা যেতে পারে সেগুলো হল: (বাঁ থেকে ডাইনে, সঙ্গে দূরত্বও দেখানো হল।)

(৭) সর্দার পানিকর।

কাং ...	১৬,৩০০ ফুট	৩৫	মাইল	যুবনু ...	১৯,৪৫০ ফুট	৩৩	মাইল
জান্নু ...	২৫,৩০০ ফুট	৪৭	”	শিম্ভু ...	২২,৩০০ ফুট	৪৫	”
লিটল কাবরু	২১,৯০৭ ফুট	৪০	”	নরসিং ...	১৯,১৫০ ফুট	৩২	”
কাবরু ...	২৪,০১৫ ফুট	৪০	”	সিনিওলচুম ...	—	৪৭	”
তালুং ...	—	৪৩	”	চোমিওমো ...	২২,৩৮৫ ফুট	৭২	”
কাঞ্চনজংঘা	২৮,১৫৬ ফুট	৪৭	”	লামা আন্দেম	১৯,২১০ ফুট	৫১	”
পানদিম ...	২২,০২০ ফুট	৩৭	”	কাঞ্চেনঝাউ ...	২২,৫০৯ ফুট	৭০	”

উপরে যে সব চূড়ার নাম দেওয়া হল, সেগুলির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘাই সবচেয়ে উঁচু, এবং ঐ একটি চূড়াই বিখ্যাত। দার্জিলিং এ যাঁরাই গেছেন তাঁরাই একবার অন্ততঃ ঐ চূড়াটি দেখবার জন্য আকুল হয়েছেন। "উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর" একটা দেখার মত ব্যাপার। দুঃখের বিষয় বছরের অধিকাংশ সময় এটির দেখা পাওয়া যায় না, মেঘ বা কুয়াশায় ঢাকা থাকে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা সমেত হিমালয়ের বহু চূড়া দেখা যায় বলেই দার্জিলিং শহর গড়ে উঠেছে বলে মনে হতে পারে। কুইন অফ দি হিল ষ্টেশনস বলে এর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি এবং অ্যালপাইন ক্লাবের মাউন্ট এভারেস্ট কামটির প্রথম চেয়ারম্যান সার ফ্রানসিস ইয়ংহাসব্যানড বলেছিলেন, "স্বাভাবিক সৌন্দর্যে দার্জিলিং এর ধারে কাছে যায় এমন জায়গা পৃথিবীর কোথাও নেই। পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে লোকে দার্জিলিং-এ আসে বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখতে।" বিখ্যাত পর্বতারোহী ও লেখক ফ্র্যাংক এস স্মাইথ, বলেছিলেন, দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য জগদ্বিখ্যাত। এখানে রয়েছে উপত্যকা—যার উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে খুব উঁচু নয় আর রয়েছে বিরাটকায় ২৮, ১৫০ ফুট উঁচু শৈলশৃঙ্গ। কাঞ্চনজঙ্ঘা দার্জিলিং থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে—আর মাটি থেকে এর কৌনিক অবস্থান এক কি দু ডিগরির বেশি নয়, কিন্তু তা সত্বেও মনে হয় এটি বিশাল। কাঞ্চনজঙ্ঘার ধারে পাশে রয়েছে আরও অনেক বড় বড় শৃঙ্গ, সেগুলিকে দেখে মনে হয় যেন উত্তাল সমুদ্র। সাদা বরফকে মনে হয় সমুদ্রের ফেনা, আর নীল পাহাড়কে মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ।

এ হেন রূপসী দার্জিলিং কিন্তু কেবল দৃশ্যের জন্যই গড়ে ওঠেনি। একথা

বলতেই হবে, এই শহর গড়ে উঠেছিল ইংরেজদেরই হাতে। 'শীতে উপেক্ষিতা'র লেখক রঞ্জন লিখেছেন, আশাকরি, একথা স্বীকার করলে দেশদ্রোহিতা হবে না যে আজকের দার্জিলিং বিলাসী ইংরেজদের কল্পনা দিয়ে রচা। ঠিকই—কিন্তু এর অচিন্ত্যনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য তার মূলে ছিল না। তার মূলে ছিল দুটি কারণ। এর প্রধান কারণ জায়গাটি ছিল যথেষ্ট ঠাণ্ডা, কলকাতা থেকে সোজাসুজি মাত্র ৩৬৭ মাইল ছিল এর দূরত্ব, আর দ্বিতীয় কারণ, এ জায়গায় মশা এবং অনেক ধরনেব পোকা-মাকড়ের অস্তিত্ব ছিল না। বৃটেনকে ভারত থেকে বহু বহু কোটি টাকা লুঠ করতে হয়েছিল, সেজন্য সর্বদাই এদেশে থাকতে হয়েছিল বেশ কিছু সাহেবকে। আর সাহেবরা যখন এদেশে এল তখন গরমের জ্বালায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। কত সাহেব-মেম যে সর্দিগর্মিতে মারা গেল, মশার কামড়ে, মাছির ভনভনানিতে অস্থির হল এবং পাংখা কই, বরফ কই বলে আর্তনাদ করল তার কিছু হদিশ পাওয়া যায় সাহেবদের সেই সময়কার কিছু কিছু লেখায়। এ অভিযোগ অবশ্যই অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। মোগল সম্রাট বাবর খেদের সঙ্গে লিখেছিলেন, এমন দেশে থাকছি যে দেশে বরফ নেই! সিমলায় ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় বহু সাহেবের দুশ্চিন্তা কিছু কমলো। অনেক সাহেব আবার নিজেরা যেতে না পেরে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের সেখানে পাঠাতে শুরু করল। কিন্তু বলাবাহুল্য বিরাট ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত সাহেব ইচ্ছে করলেই সিমলায় গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন না, দরকার হল আরো সব পাহাড়ী "স্টেশন"-এর। তা ছাড়া রাজধানী কলকাতা থেকে সিমলা – দূরত্বটা প্রায় লণ্ডন থেকে ব্রিন্দিসি-র দূরত্বের মতই। কলকাতা থেকে কাছাকাছি কোনো স্টেশন কি পাওয়া যায় না?

পাওয়া যায়। দার্জিলিংই সেই জায়গা। তবে জায়গাটি ঠিক বৃটিশদের নয় তখনও, জায়গাটি সিকিমের দখলে—ব্যাপারটা একটু অসুবিধেজনক। কিন্তু কিছু কায়দাটায়দা কি করা যায় না? তা, সাহেবদের মধ্যে যত দোষই থাক, তাঁদের বুদ্ধি ছিল না এই অপবাদ কেউই দিতে পারবেনা। অতএব কিছু একটা অজুহাত খুঁজে বার করা হল।
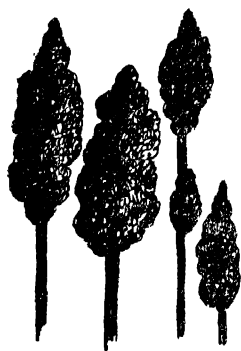
দার্জিলিং বৃটিশদের হাতে এসে গেল

১৮২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দার্জিলিং তখন মাত্র একটা নাম। হরে দরে বড় জোর শ খানেক লোক বাস করে। অজ পাড়া গাঁ বললেই ঠিক হয়। ইতিহাসে আভাস মেলে নেপাল-সিকিম সীমান্তে কিছু গোলমাল হয়েছে। বিরোধ মেটাতে পাঠানো হল দু জন বিশ্বস্ত অফিসারকে। পাঠালেন ভারতবর্ষের মহামান্য গভর্নর জেনারেল। এঁদের নাম ক্যাপটেন লয়েড এবং ক্যাপটেন হারবার্ট। কিন্তু তার আগেরও কিছু ইতিহাস আছে। ১৮১৬ সালের আগে সিকিমের সবখানিই ছিল নেপালের জবরদখলে। গুর্খাদের সীমান্ত নীতি বৃটিশদের মনের মত না হওয়ায় বৃটিশরা নেপালের বিরুদ্ধে দুবার সৈন্যদল পাঠায়। প্রথমবার সৈন্য পাঠানো হয় ১৮১৩ সালে। দ্বিতীয়বার জেনারেল অখটারলনি নেপালের সৈন্যদের পরাস্ত করার পর একটা চুক্তি হয়। চুক্তি সই হয় ১৮১৬ সালে সেগৌলিতে। এই চুক্তিতে নেপাল দখল করা চার হাজার বর্গমাইল অঞ্চল সিকিমকে দিতে বাধ্য হয়। বৃটিশদের ছিল দুটি উদ্দেশ্য— নেপাল যাতে বিশেষ আর বাড়াবাড়ি না করতে পারে সেজন্য তাকে দমিয়ে রাখা, দ্বিতীয়ত সিকিমকে মোটামুটি অনুগত রাখা। বৃটিশরা সিকিম রাজ্যকে সরাসরি নিজের দখলে না রেখে ১৮১৭র ১০ই ফেব্রুয়ারি তিতালিয়ায় অনুষ্ঠিত এক চুক্তির সাহায্যে এটিকে একটা স্বাধীন রাজ্য করে রেখে দেয়।

এবারে এখানে একটা মজার কথা বলে নেওয়া যাক। যুদ্ধ করতে খরচ লাগে। নেপালের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সুরাটের অরুণজী নানাজী। কত টাকা তিনি দিয়েছিলেন তা জানা যায় নি। 'নেপাল জয়'-এর জন্য খুসি হয়ে এই নানাজীকে খেলাত দেওয়া হয়েছিল ইতিহাসে আছে। এই খেলাত পাওয়ায় খুসি হয়ে নানাজী তিন লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দির বানান। একথা অবশ্য পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই যে সেই আমলে তিন লাখ টাকায় যা পাওয়া যেত বর্তমানে তা পেতে হলে অন্তত এক কোটি টাকার দরকার হবে। যাই হক, নানাজী তাঁর টাকা খরচ করে গেছেন নিজের খুসিতে। কিন্তু প্রায় একশো বছর পর তাঁরই বংশধররা একটি পয়সার জন্য হাহাকার করে ফিরেছেন ইতিহাসে এও লেখা আছে।

১৮১৬ সালের চুক্তিতে বৃটিশেরা নেপালের কাছ থেকে আরও কয়েকটি পাহাড়ী জায়গা নিজের দখলে নিয়ে নিল—সেগুলি হল আলমোড়া (৫,৫১০ ফুট), মুসৌরী (৬,৬০০ ফুট), নৈনিতাল (৬,৪০৭ ফুট) এবং সিমলা (৭,০৭৫ ফুট)। সাহেবরা যাতে গরমকালে সমতলের "ধুলোয়ভরা গনগনে গরম" আবহাওয়া ছাড়িয়ে একটু বেশ দিশী-দিশী আবহাওয়ায় থেকে কথঞ্চিৎ সুখ উপভোগ করতে পারেন সেজন্যই এত কাণ্ড করা হয়েছিল।

১৮২৮ সালে ক্যাপটেন জি এ লয়েড (পরে তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হন) এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জে ডবলিউ গ্র্যাণ্ট নেপাল এবং সিকিমের মধ্যেকার বিবাদ মিটিয়ে চুংটংএ গিয়ে পৌছন। চুংটং বর্তমান দার্জিলিং শহর থেকে পশ্চিমদিকে অল্প কিছু দূরে। তখন জায়গাটিকে দেখে তাঁদের মনে হল, জায়গাটা তো বেশ! তার পরের বছর গ্র্যাণ্ট এলেন, জে ডি হারবার্টের সঙ্গে। হারবার্ট ছিলেন বাংলার ডেপুটি সারভেয়র জেনারেল। এই অধ্যায়ের প্রথমে এঁদের দার্জিলিংএ আসার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন জায়গাটিকে একটা স্বাস্থ্যাবাস হিসেবে গড়ে তোলা যায়। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গ দার্জিলিংকে হস্তগত করার জন্য সিকিম সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে নির্দেশ দিলেন লয়েডকে। বলা হল দার্জিলিংএর বদলে সিকিম ইচ্ছে করলে টাকাও নিতে পারে কিংবা ঐ পরিমাণ জমি। আলোচনার পর আলোচনা শেষ হল ১৮৩৫ সালে। বৃদ্ধ রাজা সিকিমপুত্তি রাজি হলেন

লম্বায় ২৪ মাইল আর চওড়ায় ৫।৬ মাইল জমির টুকরো ইংরেজদের দিতে। স্থির হল এর বদলে রাজা বছরে পাবেন তিন হাজার টাকা। পরে এই পরিমাণ বাড়িয়ে করা হয়েছিল ছ হাজার টাকা। ঐ সময়ে অবশ্য সিকিমের রাজার কাছে ঐ টাকার পরিমাণ বেশ বেশিই ছিল, কেননা এর আগে খাজনা ইত্যাদি বাবদ ঐ জমি থেকে সিকিম রাজের বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি টাকারও কম। এই জমি ছিল 'উপহার'। এটা অবশ্যই আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত উপহার ছিল না, তা যদি হত তাহলে কয়েক বছর ধরে তা নিয়ে আলোচনা চালাতে হত না! দানপত্র স্বাক্ষরিত হল ১৮৩৫ এর ১লা ফেব্রুয়ারি। তাতে লেখা রইল—

> The Governor general, having expressed his desire for possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Government, suffering from sickness, to avail themselves of its advantages, I the Sikimputtee Rajah, out of faiendship for the said governor general, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land south of the great Rangit river, East of the Balasun, Kahail and Little Rangit rivers and west of Rungnu and Mahandi river.

দলিল দস্তাবেজ দেখে কে বলবে এই উপহারের পেছনে ছিল কতখানি লোভ আর হুমকি!

কিন্তু দার্জিলিং জয় তখনও অসম্পূর্ণ। আরও জমি ইংরেজদের চাই।

১৮৩৬ সাল থেকেই শুরু হল উপহার পাওয়া দার্জিলিং এর জরীপ। কোথায় কি আছে তার হিসেব নিকেশ করা। লেফটেন্যান্ট জেনারেল লয়েড কে করা হল দার্জিলিং-এর স্থানীয় এজেন্ট। ১৮৩৯ সালে লোক্যাল এজেন্ট পদটি বাতিল করা হল, সে জায়গায় শুরু করা হল সুপারিটেনডেনটের পদ। এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন ডঃআর্থার ডি ক্যাম্পবেল,এবং ২২ বছর তিনি ঐ পদে বহাল রইলেন। ১৮৩৯ সালেই ভার দেওয়া হল মাগডালার লর্ড নেপিরিয়ারকে দার্জিলিং শহরকে পত্তন করতে।

এ ছাড়া শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত রাস্তা এবং সাহেবগঞ্জের ওপার কারগোলা ঘাট থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বড় রাস্তা তৈরির ভারও পড়ল তাঁর উপর। এ দুটি রাস্তাই সম্পূর্ণ হল ১৮৬৬ সালে। খরচ পড়ল ১৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ ছিল না। প্রধান বাধা ছিল কুলি। তখন তো আর আজ কালকার মত যাতায়াতের সুবিধে হয়নি, মানুষ সহজে দেশের মধ্যেও দূরে কোথাও যেতে চাইত না। সেই সময় কুলি সংগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

তখন সিমলার পত্তন হয়ে গিয়েছে—১৮৩৯-এ দার্জিলিংকে 'ভবিষ্যতের সিমলা' বলে উল্লেখিত হয়েছে। ক্যালকাটা কুরিয়ার পত্রিকায় একটি আশাব্যঞ্জক খবর বেরুল ১৮৩৯ এর ২রা জুলাই। তাতে সংবাদ দেওয়া হল হাজারীবাগ জেলা থেকে দার্জিলিং এর জন্য কুলি সংগ্রহ হয়েছে। সংখ্যায় তারা ৫০০ জন। ১৫ই অক্টোবর তারা গিয়ে পৌঁছবে তিতালিয়া। আশা প্রকাশ হল, ১৮৪০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই "সমতল ভূমির দারুণ গ্রীষ্ম" এড়িয়ে মান্যবজনেরা—অর্থাৎ কিনা সাহেব জনেরা দার্জিলিং-এ গিয়ে ঠাণ্ডা হতে পারবে।

আর ৫০০ কুলির জন্য খরচ পড়বে কত? যারা ভবিষ্যতের সিমলা গড়ে তুলবে তারা বাড়ি ঘর ছেড়ে দূরে গিয়ে ঐ অসম্ভব পরিশ্রমের কাজ করবে। পরিবর্তে তাদের জুটবে কি? থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা—আর মাসে ৪০০ টাকা।

এই ৪০০ টাকা শুনে মনে হতে পারে বোধ হয় প্রতিটি কুলি মাসে ঐ পরিমাণ টাকা পাবে, কিন্তু তা নয়—৫০০ কুলির জন্য ৪০০ টাকা, অর্থাৎ মাথা পিছু মাসে আজকালকার হিসেবে ৮০ পয়সা! ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শোষণ চালিয়ে ছিল তার একটা রূপ এই হিসেব থেকেই পাওয়া যাবে! ঐ কুলিদের খেতে দেওয়া হবে—কিন্তু কি খেতে দেওয়া হবে তা লেখা নেই, কোথায় থাকতে দেওয়া হবে তাও নয়। আর পোশাক? তার উল্লেখ তো করাই হয়নি। যদি কেউ বলেন দার্জিলিং এর পত্তনের মূলে কারা? এর উত্তর নির্দ্বিধায় দেওয়া যায়, ঐ প্রথম ৫০০ জন কুলি। তারাই পাহাড়ী পথ বানিয়েছিল, তারাই বানিয়েছিল দার্জিলিং শহরের প্রথম বাড়িঘর। তাদের নাম দার্জিলিং এর ইতিহাসে অনুপস্থিত। কতজন যে অসুস্থ হয়ে ঠাণ্ডায় মরে গেছে, কতজন যে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সমস্ত জীবনের জন্য অসমর্থ হয়ে পড়েছে, তার হিসেব একমাত্র অনুমানেই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু হয়ত অনুমান করাও সম্ভব নয়।

১৮৪০ সালে দেখতে পাই ঐ কুলিদের কাজকর্ম বেশ "সন্তোষজনক"। ক্যালকাটা কুরিয়ার-এ ১০ ফেব্রুয়ারি এক টুকরো খবর বেরুল—দার্জিলিং-এ রাস্তা, বাজার এবং আরও নানারকম কাজ বেশ ভালমতই চলছে। গত মাসে (অর্থাৎ, জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতে) কাজকর্ম ভাল হয়েছে।

এর আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছে দার্জিলিং-এর মানচিত্র। ১৯৩৯ সালের জুলাইতে বিজ্ঞাপন বেরুল, নগদ তিন টাকায় পাওয়া যাবে দার্জিলিং-এর তিন-খানা ম্যাপ।
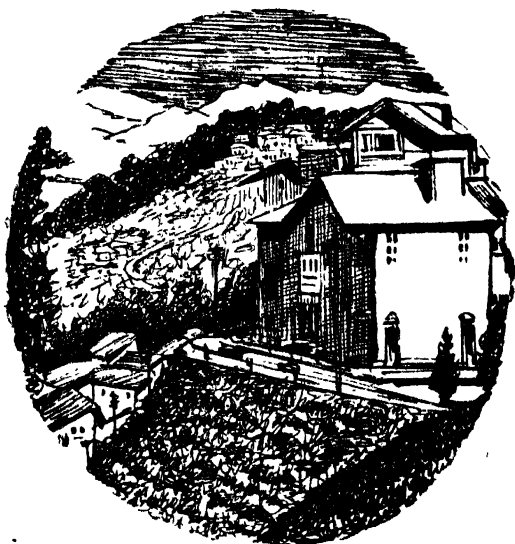
দার্জিলিং তখন গড়ে উঠছে

ইংরেজদের উৎসাহ দেখে কে। জায়গাটা মনের মতন। একেবারে যেন ইংল্যাণ্ডকে নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া। তার সঙ্গে ফাউ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গগুলির অপরূপ শোভা! এই জায়গায় হাজারীবাগের কুলিরা এবং অন্যান্য কুলিরা বানাতে লাগল ইংরেজদের জন্য ঘর বাড়ি পার্ক বাগান গীর্জে। তবে ইংরেজরা হুট করে কোনো কাজে হাত দেয় না। যত লোভনীয়ই হক না কেন কোনো প্রস্তাব রূপায়িত করার আগে চায় একখানা রিপোরট। আর দার্জিলিং-এর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দার্জিলিংকে স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে গড়ে তোলা যায় কিনা এ নিয়ে সরকার রিপোর্ট চাইলেন। এক বছর ধরে সেখানে থেকে তবে সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে। কিন্তু বছর শেষ না হতেই কানাঘুষায় রিপোর্টের সারমর্ম প্রকাশিত হতে লাগল, এবং বলা বাহুল্য, সে সব রিপোর্টে দার্জিলিং-এর বিরুদ্ধে একটি বাক্যও লেখা হল না। ১২ আগস্ট ১৮৩৭ এর "ইংলিশ ম্যান"-এ বেরুল, যে সব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে লোকেরা যথেষ্ট

উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। আর উৎসাহী না হবেনই বা কেন। ভারতের মত গরম জায়গায় ইংল্যাণ্ডের মত ঠাণ্ডা অঞ্চল পাওয়া গেছে, আবার সেখানে থাকাও যাবে এমন একটা সংবাদে তখনকার ইংরেজরা খুশি হয়ে উঠবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। আজকাল মাটির তলা খুঁড়ে তেল বের হলে দেশে আনন্দের হাওয়া বয়ে চলে, তখন কলকাতা থেকে খুব দূরে নয় এমন একটা জায়গা পাওয়া গেল যা ঠাণ্ডা—আর আনন্দের হাওয়া বয়ে চলল, যেন পাওয়া গেছে মহামূল্য এক সম্পত্তি! দার্জিলিং-এ যেতে হবে, অতএব সেখানে ঘরবাড়ি বানানো হতে লাগল, আর খবর এল একটা হোটেল খোলা হয়েছে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজি খবরের কাগজে লেখা হল, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারেনা! খবর প্রকাশিত হল ১৮৪০-এর ৮ই এপরিল। খবর পাঠানোর তারিখ ১লা এপরিল। সেখানে লেখা হল, গত কাল (অর্থাৎ ৩১ মারচ) হোটেলটি তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে।

তারপর সে সম্পর্কে আরও লেখা হল—আমরা বারো জন মিলে বসলাম, খুব মজাদার পার্টি হয়েছিল সেটা, খুব ফুর্তি! ওয়ারম্যান যা করেছেন তা বেশ ভাল ভাবেই করেছেন, একেবারে আশাতীত। ঘরগুলোয় বেশ আলো ছিল, আর প্রতি ঘরে দু দুটো করে আগুন পোয়াবার জায়গা থাকায় ঠাণ্ডা-টাণ্ডা একেবারেই কাছে ঘেঁষতে পারেনি। চিমনির সঙ্গে লাগানো থার্মোমিটারে পারা উঠেছিল ৬৫°তে। নৈশ ভোজ যা হল তাও বড় সুন্দর, ভারি সুন্দর রান্না আর পরিমাণও যথেষ্ট। আমি এর চাইতে অনেক খারাপ হোটেল কলকাতায় দেখেছি, আর এর চাইতে ভাল হোটেল দেখেছি কদাচিৎ!

এরপর রয়েছে কেকের বর্ণনা। ইংরেজদের প্রিয় এই বস্তুটি সম্পর্কে সংবাদদাতা লিখলেন—কেকের কথাটাই বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। কেক তো হয়েছিল চমৎকার। কেকের উপর লেখা ছিল দার্জিলিং হোটেল, ৩১ মারচ ১৮৪০।

এই দার্জিলিং হোটেল শুরু করেছিলেন ওয়ারম্যান এবং তাঁর গৃহিণী। তাঁদের সম্পর্কে বলা হল—এঁরা যে কাজের ভার নিয়েছেন তা এঁদেরই উপযুক্ত। এঁরা ভারি সুন্দর মানুষ, আর খুবই পরিশ্রমী। আর সব যদি ঠিক মত চলে তাহলে এই পরিশ্রমের মূল্য তাঁরা নিশ্চয়ই পাবেন।

এরপর লেখা হল—আবহাওয়া দিনকে দিন আরও ভাল হচ্ছে। ভ্রমণের সুবিধে দিনকে দিন বাড়ছে—খাবার দাবার, কাজের লোক সবকিছুরই উন্নতি হচ্ছে।

মাস খানেক গেল। হোটেল তো হল, কিন্তু লোকজন কেউ নেই। ঐ বছরেরই ৩০শে এপরিল দার্জিলিং থেকে লেখা হল—আপনাদের 'প্রাসাদ নগরী' থেকে একজনও আসেননি, তবে ক্রস, রাসেল এবং স্মিথ-দের কথা যদি ধরেন তো সে কথা আলাদা। এদিকে হোটেল তো খরিদ্দারের জন্য রীতিমত প্রস্তুত। রাস্তাও চমৎকার, আর এর জন্য সত্যিকারের প্রশংসা প্রাপ্য দার্জিলিং এর সুপারিনটেনডেণ্ট ডকটর ক্যাম্পবেল; লেফটেন্যাণ্ট নেপিয়ার এবং মণ্টগোমারির। (আমার কাছে তো রাস্তা ঘাট একেবারে আশাতীত!) একটা স্কুলও খোলা হয়েছে। হেপার আর মার্‌টিন খুব পরিশ্রম করছেন বাড়ি গুলোর শেষ পর্যায়ের কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে। একটা গীর্জেও তৈরি করার কথা হচ্ছে। হাসপাতালের কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। বাজারও শুরু হয়ে গেছে, সেখানে ইউরোপীয় জিনিসপত্র, যেমন উলের তৈরি জামাকাপড় ইত্যাদি পাওয়াও যাচ্ছে ইতিমধ্যে। আর এসব তো সহজে হয়নি—বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করেই সম্পন্ন হয়েছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও দার্জিলিং-এ আশানুরূপ মানুষজনের দেখা মিলল না। সে মাসটাও যায় যায়। খবরের কাগজে দুঃখ করে লেখা হল, দার্জিলিং-এ প্রায় এক ডজন বাড়ি তৈরি হয়েছে, আর দুটো হোটেলও খুলে গেছে। দুটো হোটেলে পঞ্চাশ জনের জায়গা, অথচ ১৪ই মে পর্যন্ত মাত্র একজন লোকের দেখা পাওয়া গেল!

১৪ই মে—অথচ সে বছর দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছেন মাত্র একজন লোক! ব্যাপারটা আশ্চর্য করে দেয়। ঐ একজন লোক দার্জিলিং-এর প্রায় জনহীন পথে ঘুরছেন, এবং হয়ত মনে মনে ভাবছেন, মরতে কেন এখানে এলাম? এই লোকটির নাম জানতে পারলে ভাল হত। দার্জিলিং এর ইতিহাসের সঙ্গে এর নাম যুক্ত হতে পারত।

দার্জিলিং তো তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পর্যটক হিসেবে ১৮৪০ এর মে মাসের ১৪ তারিখ পর্যন্ত সেখানে গিয়েছেন একজন! ২৬ মের খবরে প্রকাশ, ঐ সময়ে দার্জিলিং-এ ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা সর্ব সাকুল্যে ২৮ জন।

অথচ দার্জিলিং এর আবহাওয়া চমৎকার ! তার পরের বছর, ১৮৪১ এর আগষ্ট মাসে আবহাওয়া সম্পর্কে লেখা হল—দার্জিলিং এর আবহাওয়া এবারে দারুণ ! এ মাসের বৃষ্টি অনেক কম, রোদ্দুর একেবারে ঝলমলে। আগষ্ট মাসের পক্ষে এ খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

এত ভাল দৃশ্য, এত ভাল আবহাওয়া, এত সুন্দর সব ব্যবস্থাপনা, নতুন নতুন বাড়ি-ঘর, অথচ মানুষ নেই। তবে মানুষদের দোষ দেওয়া যায়না। মানুষ যারা—অর্থাৎ পয়সাওলা ইংরেজ, তারা থাকে কলকাতায়। সেখান থেকে দার্জিলিং-এ যাওয়া খুব তো সহজ ব্যাপার নয়।

দার্জিলিং যাওয়া সহজ ছিল না

১৮৪১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিং জনবিরল-ই রইল। তবু মানুষ আশা ছাড়ে না। কলকাতা ছেড়ে দার্জিলিং-এ পুজোর ছুটিতে অনেকে যাবেন এমন আশা প্রকাশ হল, ২৮শে সেপ্টেম্বরের কাগজে। বলা হল—আগামী দুর্গা পুজোর সময় দার্জিলিং-এ খুবই লোক সমাগম হবে, আর জায়গাটা জনপ্রিয়ও হয়ে উঠবে। দার্জিংলিং-এ এবার পুজোর ছুটি কাটাতে যাঁরা যাবেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় স্যার জে পি গ্র্যানট, স্যার এইচ ডবলিউ সেটন, মিস্টার ডবলিউ পি গ্র্যানট এবং তাঁর পত্নী, মিস্টার হেনরি হলরয়েড এবং তাঁর পত্নী, এ ছাড়া মিস্টার স্মোলট এবং তাঁর পত্নী।

মন্তব্য করা হল—এর চাইতে ভাল সময় আর হতে পারে না।

উপরের নামগুলির মধ্যে কলকাতার ইতিহাসে কাউকে কাউকে দেখা যাবে।

শেষে যাঁর নাম, সেই স্মোল্ট সম্ভবত দার্জিলিং-এর প্রথম গাইড বই লেখেন। ১৮৪১ এর অক্টোবর এর মধ্যেই তা প্রকাশিত হয়। খবরের কাগজে মন্তব্য করা হয়, এই গাইড বইখানা চমৎকার হয়েছে। জনসাধারণের খুবই কাজে দেবে। এর ভেতরকার ড্রইংগুলো আকর্ষণীয়। এই বই দেখার পর জনসাধারণ খুবই দার্জিলিং-এ যেতে আগ্রহী হবেন এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

কিন্তু আগ্রহী হবেন যে, যাবেন কেমন করে?

কেবল ভ্রমণকারীর দলসমেত দার্জিলিং-এ যাওয়া নয়, তাঁদের থাকাও নয়, তাঁদের জন্য দরকার খাদ্য এবং আরও নানা জিনিসও। দার্জিলিং বাজারে তখন ভাল কিছু পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও দাম অনেক। ১৮৪১ এর আগস্টের

সংবাদে লেখা হল, তিতালিয়া থেকে খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্র উপরে দার্জিলিং এ নিয়ে যাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। দার্জিলিং-এর বাজারে তো কিছুই প্রায় মেলে না। এখানে তেল পাওয়া যায়, দাম টাকায় দু সের। সাধারণ চিনিরও ঐ একই দাম, এক মন ডালের দাম চার পাঁচ টাকা, আর ডাল প্রায় অখাদ্যই বলা যায়। সাধারণ চাল পাওয়া যায় টাকায় ১৪ সের, মুরগী হাঁস দুষ্প্রাপ্য, কালেভদ্রে জোটে, আর দাম কলকাতার চাইতে শস্তাও যে তা নয়। তাজা ডিম কখনও পাওয়া যায়—টাকায় দেয় ষোলো কিংবা কুড়িটা।

এমন কথা শুনলে কারই বা দার্জিলিং যেতে ইচ্ছে করে? যে দাম উপরে দেওয়া হল তা আজকের হিসেবে খুব সস্তা মনে হলেও সে যুগে একে খুবই আক্রা বলা যায়। কিন্তু দার্জিলিং-এ গিয়ে পড়াটাই ছিল তখন বিরাট একটা সমস্যা। পথে নানা বিপদ আপদও ছিল। একটা কথা বললে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে—সে সময় রেলগাড়ির চলন এদেশে হয়নি! তখন দূরদেশে যাতায়াতের উপায় ছিল হাঁটা, অথবা নৌকো পালকি আর ঘোড়া।

তবু দার্জিলিং-এ যাওয়ার লোকের অভাব প্রথম দিকে হলেও পরে হয়নি। রাস্তার ঐ অসুবিধে সত্ত্বেও মানুষ দার্জিলিং ঠিকই গিয়েছে। বিশেষ লোকের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ১৮৪০ এর ৭ই মে ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল দার্জিলিং গিয়েছিলেন। প্রায় চারশো মাইল পথ, যাতায়াতে আটশো মাইল। ১০০ কুলিকে এই কাজে লাগানো হয়েছিল। কলকাতা থেকে দার্জিলিং যেতে লেগেছিল সাড়ে চারদিন। আসতেও ঐ একই সময় লেগেছিল। খবরের কাগজে লেখা নেই তিনি কি ভাবে বাহিত হয়েছিলেন। মনে হয় তাঁকে নিয়ে পালকীর 'রিলে রেস' হয়েছিল। একদল কুলী তাঁকে কয়েক মাইল বয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একদল কুলি তাঁকে তুলে নিয়ে ছুটে ছিল, এইভাবে তিনি গিয়েছিলেন দার্জিলিং। ব্ল্যাক ম্যানস বার্ডেন একেই বলে!

এই অ্যাডভোকেট জেনারেলের নাম ছিল টার্টন।

আরও আগে (১৮৩৭) দার্জিলিং যাওয়ার অসুবিধে নিয়ে এক ব্যক্তি লিখেছেন: এ যাবত দার্জিলিং-এ যাওয়ার পথে অসুবিধেই কেবল ভাগ্যে জুটেছে। জঙ্গল, ক্ষুরধারা নদী, মশা এবং "পীপরাস" (অর্থাৎ কিনা এই পীপরাস হল পিঁপড়ের দল)। এ সবই হয়েছে অসময়ে দার্জিলিং-এ যাওয়ার ফলে

(নভেম্বর)। তবে শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং এ পৌঁছে দেখা গেল এর জন্য যে সব অসুবিধেয় পড়া গিয়েছিল সেগুলো তুচ্ছ। সে যে কি বিরাট আশ্চর্যজনক দৃশ্য তার সামান্য ধারণা করানোও একেবারে অসম্ভব!

এই লেখক এই সঙ্গে লিখছেন—দার্জিলিং-এ জলের অভাব নেই বলেই আমার মনে হয়েছে। অসুবিধের মধ্যে একটাই—আর তা হল পিঁপড়ের দল, এরা কিছুটা বেলে মাছির মত। এরা সত্যিই খুব বিরক্ত করে!

এই একমাত্র লোক যিনি দার্জিলিং-এ পিঁপড়ের উৎপাতের কথা বলেছেন। এর আগের বা পরের কারুর লেখাতেই এই বিপদের কথা পাওয়া যায় না।

আগেকার লোকেরা কি ভাবে দার্জিলিং-এ যেতেন? কোন পথে? ১৮৪০-এর ক্যালকাটা কুরিয়ার-এ তা নিয়ে এক বিরাট বর্ণনা বেরুল।

দার্জিলিং রোড

প্রথম পর্যায়—আগরপাড়া

২য় „ —জেরেটি, ১৭ মাইল। তারপর হুগলী নদী পার হতে হবে হবে পলতায়। এখানে সরকারী ফেরি রয়েছে।

তৃতীয় „ হুগলী। ২৬ মাইল। বাংলো নেই। বাজার আছে হুগলী এবং চুঁচুরায়। বাংলো না থাকলেও রাত কাটানোর জন্য বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

চতুর্থ „ নই স্বরয়। হুগলী থেকে ৮ মাইল। স্বরস্বতী নদী পার হতে হবে তিরবুনি-তে, নিয়াসরাইএ কুন্তীর নদী পার হতে হবে—সরকারী ফেরিতে। হুগলী থেকে ৬ মাইল দূরে তিরবুনি। রাস্তা নিয়াসেরাই পর্যন্ত ভাল। নিয়াসেরাইএ একটা সেতু আছে, কিন্তু পার হওয়ার উপযুক্ত নয়। সেতু এবং রাস্তা মেরামতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখানে দিশী লোকের উপযোগী একটা বাজার রয়েছে, বাংলো নেই।

পঞ্চম পর্যায়—ইনচুরা—৮ মাইল। দুটো নালা পার হতে হয়। একটায় সেতু রয়েছে, অন্যটিতে ফেরির ব্যবস্থা নেই। বাংলো নেই। ইনচুরা থেকে ৪ মাইল দূরে সরকারী ফেরির ব্যবস্থা আছে। গোকুলগঞ্জ আর গুপ্তিপাড়ায় আধ মাইল চওড়া চর অতিক্রম করতে হয়। নদীর অপর পারে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের তদারকিতে ফেরির ব্যবস্থা রয়েছে।

ষষ্ঠ পর্যায়—শান্তিপুর ৮ মাইল। এখানে সরকারী ফেরিতে হুগলী নদী পার হতে হবে। স্থানীয় লোকেদের (নেটিভ) জন্য বাজার রয়েছে, বাংলো নেই। শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর রাস্তা ভাল। কোন রকম বাধা নেই।

সপ্তম পর্যায়—কৃষ্ণনগর ১২ মাইল। দিগ্‌নগরে বাজার রয়েছে। বাংলো নেই। হুগলী থেকে কৃষ্ণনগর বাজার, আবহাওয়া ভাল

থাকলে ১৪ ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। বেহারারা শান্তিপুর ডাকঘরে বিশ্রাম নিতে পারে। এখানে একটা ডাক বাংলোর জরুরী প্রয়োজন।

অষ্টম পর্যায়—কৃষ্ণনগর থেকে খুরিয়া বা জেলিঙ্গী নদী পার হতে হবে। একটা নদীতে সেতু নেই, এখানে নৌকো রয়েছে, ভাড়া না দিলেও চলে।

নবম পর্যায়—বেলেড়—৯ মাইল। বাংলো।

দশম পর্যায়—বিক্রমপুর—৯ মাইল। তিনটি মুদীর দোকান রয়েছে। এখানে একটা ডাক বাংলোর বিশেষ প্রয়োজন।

একাদশ পর্যায়—১২ মাইল দূরে মেরাই। মেরাই-এর ২ মাইল দক্ষিণে সরু একটা নদী পার হতে হবে। নাম পানিঘাটা। নৌকোর ভাড়া না দিলেও চলে। দেৎগাঁ-তে দুটো মুদীর দোকান আছে।

দ্বাদশ পর্যায়—বোরা অথবা বরুয়া ১২ মাইল। বহরমপুরের দু মাইল উত্তরে চিটাগং নালা পার হতে হবে। বর্ষার সময় ৩০ফুট চওড়া নৌকায় পার হতে হয়। বহরমপুর থেকে বোমোনিয়া পথে বাজার প্রচুর রয়েছে। এই বিভাগে ডাক বাংলো নেই। কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর, ডাক এক রাতের পক্ষে খুবই দীর্ঘ। দাউদপুরে দুতিনখানা ঘর এবং পাচক সমেত একটা ডাক বাংলোর বিশেষ প্রয়োজন। আরও একটা এই রকম ডাক বাংলো দরকার কামরায়। সবচেয়ে বেশি লোক দার্জিলিং-এর পথে যাবেন গ্রীষ্মকালের শুরুতে। এঁদের মধ্যে এমন অনেকেই থাকবেন যাঁরা অসুস্থ। নারী এবং শিশুরাও থাকবেন বেশ কিছু। এঁদের সুবিধের জন্য সমস্ত পথে কিছু দূরে দূরে বাংলো তৈরী করা দরকার। তাহলে এক এক রাত ডাক-এ গিয়ে দিনে এই সব বাংলোয় বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হবে। এরকম সুবিধের জন্য ভ্রমণকারীরা খুসির সঙ্গে কিছু পয়সাও দেবেন।

> কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরের রাস্তা সাধারণত ভাল। যে সব জায়গায় রাস্তা বৃষ্টিতে বা জলে ধুয়ে গেছে সে সব জায়গা মেরামত করা হলে ঘোড়ার গাড়িও চলতে পারবে। রাস্তা ভাল থাকলে লোকেরা অধিকাংশ পথ ঘোড়ার গাড়িতেই যায়।
>
> ভালো আবহাওয়ায় কৃষ্ণনগর থেকে বিকেল ৫ টায় রওনা দিলে বহরমপুরে পৌছানো যায় পরদিন সকাল ৭ টায় ঐ সময় বড় নদী জলঙ্গী পার হতে হবে। দ্বিতীয়বার পার হতে হবে মেরাই থেকে এক 'কোশ' দূরে পাংহাটায়। কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ডাক বাংলো নেই।

দার্জিলিং যাওয়া যে কত কঠিন ছিল তা এই বর্ণনা থেকেই পাওয়া যায়। এখনও তো আমরা পথেই রয়েছি। কত অসংখ্য নদী আমাদের পার হতে হচ্ছে। কত বাজার থেকে খাদ্য কিনতে হচ্ছে। অসহ্য গরম—ফলে দিনের বেলা পথ চলা বন্ধ করতে হচ্ছে, চলতে হচ্ছে রাত্রি বেলা। এই 'পথ' আজ আর নেই। ভুল হল। এই পথ মানুষের বসতির প্রথম থেকেই ছিল, এখনও সমস্ত বিলুপ্ত হয়নি, কেননা এগুলি স্থানীয় যাতায়াতের কাজে এখনও হয়ত লাগে, কিন্তু যাঁরা দার্জিলিং যাবেন তাঁদের এই পথের আর ততটা প্রয়োজন নেই। এরই মধ্যে যে পথে কলকাতা—শিলিগুড়ি—কলকাতা বাস চলে সেটা অবশ্য দরকার। প্রতিদিনই এসপ্ল্যানেড থেকে সন্ধে বেলা দুটো বাস শিলিগুড়ি যায়। এবং দিনের পর দিন নয়—একটা রাত মাত্র চলেই সকালে পৌছে যায় শিলিগুড়ি। তারপর শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং, সেও ট্যাকসি বা মিনিবাসে ঘণ্টা দেড়েকের ব্যাপার।

পথের শেষ এখনও হয়নি

আমরা বহরমপুর পর্যন্ত এসেছি। দার্জিলিং এখনও অনেক দূরে। গরমে আমাদের অসুবিধে হচ্ছে। রাতের বেলাতেও গরমের হাত থেকে নিস্তার নেই। তবু দিনের বেলার অসহ্য গরম থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায় রাত্রি বেলা।

পথ চলছি রাত্রিতেই। সকাল হলেই আশ্রয় স্থল খুঁজছি। কখনও ডাক বাংলোয়, কখনো ডাকঘরে, কখনো কারুর বাড়িতে। এইভাবে দার্জিলিং-এর পথে চলতে হত প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে। বহরমপুর আসতেই আমাদের কয়েকদিন কেটে গেছে, কেননা আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল টারটন নই। আমাদের জন্য সমস্ত পথে ১০০ জন কুলি পালকী বইবার জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই। আমাদের এইভাবেই যেতে হত। আমরা সাধারণ মানুষ।

কিন্তু ঠিক সাধারণ নই আমরা, যে অর্থে একজন কালোরঙের কুলি সাধারণ। আমাদের রং সাদা। আমরা ইউরোপীয়। আমাদের গরম বেশি লাগে, গা পুড়ে যায়। 'নেটিভ' রা আমাদের বয়ে নিয়ে যায়, সে হিসেবে আমরা সাধারণ নই। আমরা সায়েব। আমরা এদেশে এসেছি। থাকছি। থাকব আরও কয়েকশো বছর। আমাদের সুখের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে।

কথাগুলো একজন কাল্পনিক ইংরেজের উক্তি। তখনকার ইংরেজরা সম্ভবত এভাবেই ভাবতেন।

এবারে আবার পথ চলা শুরু হল। এবারে রাস্তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া যাবে না, কেননা স্থানাভাব।

চতুর্দশ পর্যায়—বহরমপুর থেকে বামিনিয়া। পাকা রাস্তা। সেখান থেকে দেওয়ান সেরাই। বর্ষাকালে পথ খুবই খারাপ। দেওয়ান সেরাই থেকে পরপর পাঁচ ছটা নালা পার হতে হয়। বর্ষাকালে নৌকো লাগে। কামরা থেকে শিবগঞ্জ যেতে আবার তিন চারটে নালা পার হতে হয়। শুকনো সময়ে এ সব পার হওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু বর্ষাকালে নৌকোর সাহায্য নিতে হয়। কামরা পোস্ট অফিসই একটা নৌকোর উপর খোলা হয়েছে। শিবগঞ্জ থেকে মহিদপুর যেতে দুটো নালা।

পঞ্চদশ পর্যায়—বামুনিয়া—১৪ মাইল।

ষোড়শ পর্যায়—দেওয়ান সুরয়—৮ মাইল।

সপ্তদশ পর্যায়—কামরা—১০ মাইল।

অষ্টাদশ পর্যায়—শিবগঞ্জ—১২ মাইল।

ঊনবিংশ পর্যায়—মহুদেনপুর—১২ মাইল।

বিংশ পর্যায়—ইংলিশ বাজার (মালদা)—১২ মাইল।

একবিংশ পর্যায়—মালদার পর মহানদী পার হতে হবে।

দ্বাবিংশ পর্যায়—পুরুয়া—১২ মাইল।

ত্রয়োবিংশ পর্যায়—গাজোল ১২ মাইল।

চতুর্বিংশ পর্যায়—দেওতোলা—১২ মাইল।

পঞ্চবিংশ পর্যায়—তাম্বোলি—১২ মাইল।

ষড়বিংশ পর্যায়—ডুগডুগি—১২ মাইল।

সপ্তবিংশ পর্যায়—দিনাজপুর—১০ মাইল। এরকম খারাপ রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না। বেশ কিছু পথ গিয়েছে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে—সেই জঙ্গলে রয়েছে বাঘ! আর পয়সা দিলেও মানুষ বা পশুর জন্য খাদ্য জুটবে না এ পথে।

অষ্টবিংশ পর্যায়—কান্তনগর ১৩ মাইল।

এইভাবে চলতে চলতে আরও আরও অনেক পর এল তিতালিয়া। তারপর হাঁটতে হাঁটতে কিংবা পালকিতে দার্জিলিং।

সমস্ত পথ চলতে কত দিন লাগতে পারে? এটা অনুমানের বিষয়—তবে রাত্তির বেলা চলে, দিনের বেলা থেমে বেহারাদের দ্বারা বাহিত হয়ে কলকাতা থেকে দার্জিলিং যেতে মাস খানেক লেগে যেত। আসতে এক মাস। অ্যাডভোকেট জেনারেল টারটনের কথা অবশ্য আলাদা।

আর আজ? কলকাতার কেন্দ্র থেকে দমদম, এক ঘণ্টা। সেখানে আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর বিমানে করে শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরা বিমানক্ষেত্র। সময় আরও একঘণ্টা। বিমান থেকে নেমে ট্যাক্সি বা মিনিবাসে আড়াই ঘণ্টা। সব সমেত পাঁচ ঘণ্টা।

দার্জিলিং-এ আজকাল পাঁচ ঘণ্টায় যাওয়া যায়—কিন্তু পুরনো পথটাও মন্দ কি? গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতাও তো হয়! ভ্রমণ তো কেবলি ভাল দৃশ্য দেখার জন্য ঘুরে বেড়ানো নয়। তা যদি হত তাহলে

মানুষ হেঁটে হেঁটে বেড়াতই না। বিমানে করে যখন সমস্ত হিমালয়ের উপর দিয়েই উড়ে যাওয়া যায় তখন প্রাণ বিপন্ন করে পাহাড়ের গা বেয়ে কাঞ্চনজংঘা বা এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার প্রয়োজন কি ?

প্রায় চল্লিশ বছর আগে বঙ্গশ্রীতে একটি লেখা বেরিয়েছিল, লেখাটির নাম সাইকেলে কলকাতা থেকে দার্জিলিং। যাঁরা দার্জিলিং যাওয়ার এই পথ বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা ইচ্ছে করলেই ট্রেনে করে যেতে পারতেন। তা তাঁরা করেননি। যেখানে যাওয়া হচ্ছে সেটা যেমন দ্রষ্টব্য, তেমনি পথটাও কম কিছু নয়। তবে এ ব্যাপারে সময়, অর্থ, রুচির এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যের প্রশ্ন আছে। তবু হাজারে একজন যদি একটু 'উল্টো পথ' ধরেন তাহলে মনে হয় দেশে তেজ আছে। আমাদের দেশে এই তেজ অবশ্য বিশেষ চোখে পড়ে না।প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় আমাদের হণ্টন বিরূপতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নেই ...।"

হাঁটা ব্যাপারটাই একটা অন্য ধরণের ইচ্ছের ব্যাপার। আমি হাঁটা পাগল কিছু মানুষ দেখেছি, তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে পড়ে। মধ্য প্রদেশের কয়লাখনি অঞ্চল, সেখান থেকে মনেন্দ্রগড় রেল স্টেশনের দূরত্ব প্রায় দু মাইল, আর পথও উঁচু নিচু। একটা জীপে করে স্টেশনের দিকে যাচ্ছি—শ খানেক গজ যেতেই দেখা হয়ে গেল ভূতাত্ত্বিক ডকটর দাশগুপ্তের সঙ্গে। সন্ধে বেলা, আকাশে চাঁদ উঠেছে। আমরা জীপ থামিয়ে বললাম, আসুন। ডক্টর দাসগুপ্ত বললেন, না—সুন্দর চাঁদের আলো রয়েছে, হেঁটে যেতে ভালই লাগবে।

ডক্টর দাসগুপ্ত ঐ অঞ্চলে অনেকদিন রয়েছেন। ঐ দু মাইল পথের সব কিছুই তাঁর অসংখ্যবার দেখা। এমন কি চাঁদের আলোতেও তিনি বহুবার ঐ পথে গিয়েছেন, এসেছেন। কিন্তু ঐ যে হাঁটার একটা নেশা আছে—সে নেশার বিকল্প জীপ নয়। সে নেশার উত্তর রেলগাড়ী নয়, নৌকো, মিনিবাস নয়—বিমান তো নয়ই।

হাঁটা হচ্ছে হাঁটা।
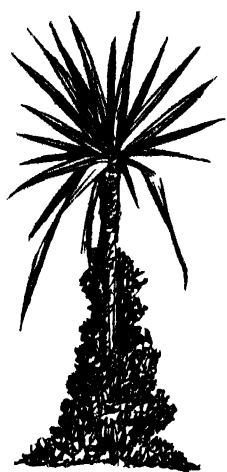
দার্জিলিং-এর শুরু শিলিগুড়ি থেকে

দার্জিলিং মেল দার্জিলিং যায় না। শিলিগুড়ি পর্যন্তও নয়। নিউ জলপাইগুড়ি বলে স্টেশন হচ্ছে এর গন্তব্যস্থান। এখান থেকে ছোট ট্রেনে দার্জিলিং-এ যাওয়া যায়। খুব ছোট লাইনের উপর দিয়ে খুব ছোট ইঞ্জিন আর খুব ছোট ট্রেন প্রায় সমতল জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এ ওঠে। ওঠে আর হাঁপায়, হাঁপায় আর ওঠে।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে তিন রকম আকারের রেলগাড়ি চোখে পড়ে, ব্রডগেজ, মিটার গেজ, আর ছোট গেজ। মনে হয় এ ব্যাপারে নিউ জলপাইগুড়ি পৃথিবীর আর সমস্ত স্টেশন থেকে আলাদা। যাঁরা 'রেকর্ড' চর্চা করেন তাঁরা এ বিষয় নিয়ে বেশ খানিক উত্তেজিত আলোচনা করতে পারেন, তাতে ক্ষতি নেই।

আরও একটা কথা। নিউ জলপাইগুড়ির প্ল্যাটফর্ম থেকে ভুবনবিখ্যাত আশ্চর্য কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং তার আশে-পাশের কয়েকটা চূড়াও চোখে পড়ে। ভোর-বেলা যখন নিউ জলপাইগুড়িতে ট্রেনটা পৌছয়, তখন "মন ভোলায় রে!" সবে ভোরের সূর্যের আলো শিখরের উপর পড়েছে, তা থেকে বেরুচ্ছে সোনার মত দ্যুতি। এমন দৃশ্য ভোলা যায় না। তবে রেল স্টেশন থেকে বিনা বাধায় দেখা

যায় না, অনেক সময়েই ইটের বাড়ির ফাঁক দিয়ে কিংবা টেলিগ্রাফ লাইনের ভেতর দিয়ে হিমালয়ের ঐ আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ে।

হিমালয় অনেক বড়। বিশাল—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

তার পরিচয় আমরা, যারা সমতল বাংলার মানুষ তারা অনেক সময়ে সমস্ত জীবনেও পাইনা। আমরা কেবল ভূগোল বইতে মুখস্থ করি, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ইত্যাদি। তাই, হঠাৎ নিউ জলপাইগুড়িতে এসে প্রায় এক শ মাইল দূরের ঐ সব গিরিশৃঙ্গগুলি দেখলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়, কেননা আমাদের "মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই……আনন্দ হয়।" নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে দৃশ্য দেখা যায় তার বিস্ময় কিছুতেই সহজে কাটতে চায় না। দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ির প্রায় সমতল ক্ষেত্রের বহু জায়গা থেকে সাদা ঝকঝকে এবং কখনও সোনালি, কখনও বিচিত্র বর্ণের এই গিরিশৃঙ্গ মানুষের মনকে নাড়া দেয়। তখন মনে হয়, এতদূর থেকে যা এত সুন্দর, তার আর একটু কাছে যাওয়া যায়না?

আর যাওয়ার যখন সব রকম ব্যবস্থা রয়েইছে তখন যাওয়ার বাধা কোথায়?

যখন হেঁটে যাওয়ার সময় নেই—দশদিনের ছুটি, এরই মধ্যে দার্জিলিং দেখা শেষ করে ফিরে যেতে হবে। "নাই নাই নাইরে সময়—" আর নাই ক্ষমতা, অনির্দিষ্ট যাত্রার উৎসাহ কিংবা অভ্যাস। চাকুরেদের সম্বন্ধে একথা খাটলেও ছাত্ররা গরমের বা পুজোর ছুটিতে হাঁটতে পারেন। কিন্তু তাও খুব বেশি হয় বলে আমার জানা নেই। বিশেষ করে, শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং হেঁটে যাওয়া বা উল্টোটা, দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি নেমে আসার মধ্যে অসাধারণ অভিজ্ঞতা কিছু হবে নিশ্চয়, যদিও এ পথে হেঁটে যাওয়ার মধ্যে যাতায়াতকারী গাড়ী, বাস, মিনিবাস মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনা। সেজন্য বেছে নিতে হয় একটু দুর্গম এবং একটু অনির্দিষ্ট শর্ট কাট, বা নেপালীতে যাকে বলা হয় "চোর-বাটোর"। এই হেঁটে চলা, এবং রাস্তার কাছে কোথাও তাঁবু ফেলে থাকা, খোলা হাওয়া ফুসফুসে নেওয়া, রাত্রে এবং দিনে প্রকৃতিকে অতি নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ

করা, আর একটু কঠিন জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। দুর্গম বলেই যাওয়ার দরকার নেই, দুর্গম বলে, "গোলমালে ভাই কাজ কি এসো, অন্য পথে হাঁটি" মনোভাব নিয়ে পৃথিবীর সবটাই এড়িয়ে এড়িয়ে গেলে কলামবাস, ক্যাপটেন স্কট, স্বেন হেদিন বা তেনজিং এর নাম ইতিহাসে কখনই লেখা থাকত না। বরং দুর্গম বলেই মনে মনে বলতে হয়, দুর্গম? কতখানি দুর্গম? একটু দেখেই আসি, পরিচয় নিয়ে আসি সেই দুর্গমতার! এখন নয়, হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের ভেতর অনেকেই দুর্গম জায়গায় অন্যরকম অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন। ইতিমধ্যেই দুর্গম জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারের জন্য নানা ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। এগুলো সবই শুভ লক্ষণ। এর সঙ্গে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতেই হবে। যে সমস্ত ভ্রমণকারী নিজেদের তাঁবু বয়ে নিয়ে যেতে অপারগ, তাঁদের জন্য জঙ্গলে রাত্রিবাস করবার জন্য আস্তানা, পাহাড়ী অঞ্চলে যাকে বলা হয় চটি, তার বন্দোবস্ত করা দরকার। পঞ্চতারকা খচিত হোটেল যেমন দরকার তেমন দরকার শস্তা হোটেল, আবার সঙ্গে সঙ্গে দরকার চটিরও। পুরনো যুগে ধর্মানুরাগী ব্যক্তিরা খুঁজে নিতেন ধর্মশালা, এখনও অনেকেই তা করে থাকেন, তবে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর পথে এধরণের কোনো আস্তানা আছে বলে এই লেখক জানে না। থাকলেও সে সম্পর্কে বিশেষ কেউ খোঁজ খবর করেনা।

শিলিগুড়ি এখন যেমন জম-জমাট পুরনো আমলে তেমন জম-জমাট ছিলনা। এখন শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের প্রধান শহর। এর নানাবিধ কারণের মধ্যে একটি হল ১৯৪৭ এর দেশ ভাগের ফলে ভারতের বৃহত্তর খণ্ডের সঙ্গে উত্তর খণ্ডের যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে যেমন তিন মাপের রেলপথ চলে গেছে নানাদিকে, তেমনি এখান থেকে সিকিম, ভুটান এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অনেক জায়গারই সহজ যোগাযোগ রয়েছে। এ ছাড়া, এই শহরই হচ্ছে উত্তরবঙ্গের অসংখ্য চা বাগানের চা বিক্রীর কেন্দ্র। সম্প্রতি এখানে চায়ের নীলাম-এরও ব্যবস্থা হয়েছে। এ ছাড়া দার্জিলিং, সিকিম ও ভুটানের কমলালেবু, এই অঞ্চলের অসংখ্য বনসম্পদ, এবং সম্প্রতি লক্ষ লক্ষ আনারস এই শিলিগুড়ি থেকেই বিতরিত। দিনকে দিন শিলিগুড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। অনেকের অনুমান, আর কয়েক বছরের মধ্যে শিলিগুড়ি বিরাট এক নগরীতে পরিণত হবে।

পুরনো আমলের শিলিগুড়ি ছিল একটা গ্রামেরই সামিল। দার্জিলিং যাওয়ার সুবিধের জন্য শিলিগুড়ি পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হয়। শেয়ালদা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত রেলগাড়ির পত্তন হয় ১৮৬২ র ২৯ সেপটেমবর। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এক বছর চার মাস। ১৮৬২র ১৫ নভেমবরের মধ্যেই পোড়াদহ পর্যন্ত ট্রেন চলল। ১৮৭৭-র ২৮ আগস্ট তৎকালীন উত্তরবঙ্গ স্টেট রেলওয়ে সারা ঘাট থেকে কয়েক মাইল উত্তর পূবের আত্রাই থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত ট্রেন চালায়। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৭ এই সময়ের মধ্যে ভ্রমণকারীরা দুভাবে শিলিগুড়ি পৌঁছুতে পারতেন। প্রথমে ই আই আর ট্রেনে করে সাহেবগঞ্জ গিয়ে রাস্তা ধরে শিলিগুড়ি, সেখান থেকে টাঙ্গায় করে টুং পর্যন্ত। অথবা ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনে শেয়ালদা থেকে পোড়াদহ, সেখান থেকে অল্প কিছুদূর হেঁটে ভ্যাড়ামারা (পুরনো কাগজপত্রে ভৈরামারা দেখা যায়) পৌঁছে নদী পার হয়ে সারা-য় গিয়ে বাকিটা হেঁটে যেতে হত। ১৮৭৭ সালে অপর পারে পৌঁছে আত্রাই পর্যন্ত হাঁটতে হত, তারপর সেখান থেকে ট্রেনে করে শিলিগুড়ি যাওয়া যেত। ১৮৮৩ সালে পোড়াদহ থেকে দামুকদিয়া ঘাট পর্যন্ত রেললাইন পাতার পর হাঁটার দূরত্ব আরও কমে গেল।

এইভাবে আস্তে আস্তে দার্জিলিং যাওয়ার পথ সহজতর হয়ে উঠতে লাগল, আর শিলিগুড়ির প্রাধান্য ক্রমশ বাড়তে লাগল। তবে শিলিগুড়ি ছিল দার্জিলিং যাওয়ার পথে বদলি হওয়ার স্টেশন। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার লোক ছিল কম। ১৮৭৮ সালে, কলকাতার সি মিটেল অ্যাণ্ড রামসে কোম্পানিকে দার্জিলিং পর্যন্ত (শিলিগুড়ি থেকে) ট্রামওয়ে তৈরি করার বরাত দেওয়া হল। ঐ বছরেরই শেষে জামালপুর ওয়ার্কসপে টয়ট্রেনের প্রথম ইঞ্জিনও তৈরি হয়ে গেল। তার নাম দেওয়া হল 'টাইনি'। ঐ সময়ে গয়াবাড়ি থেকে গিডডা পাহাড় পর্যন্ত ট্রামলাইন পাতা হয়ে গেল। ১৮৭৮-এর ১০শে আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল : Proposal of a "steam tramway from Siligoree to Darjeeling." আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল মাইল প্রতি তিন হাজার পাউণ্ড। টাইনি-কে প্রথম কাজে লাগানো হয় ১৮৮০ সালের মার্চ মাসে। যখন ভাইসরয় লর্ড লিটন দার্জিলিং-এ এলেন, তখন ক্ষুদে রেলপথের মাত্র ১৮ মাইল সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্ষুদে রেলের ক্ষুদে ইনজিন 'টাইনি' কিন্তু লাটসাহেবের সঙ্গেকার

প্রচুর মালপত্র লটবহর টানতে পারেনি। সে এক বিশ্রী ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত অগতির গতি 'ম্যান পাওয়ার' কাজে লাগানো হল। এখান থেকে ওখান থেকে সংগ্রহ করা হল অসংখ্য কুলি। তারা "হেঁইয়ো হো, হেঁইয়ো হো" করতে করতে ঠেলে নিয়ে চললো লাটসাহেব লিটনকে। ১৮ মাইল এভাবে যাওয়ার পর কার্শিয়ং এর বাকী পথটা তিনি চললেন ঘোড়ার গাড়িতে।

কার্শিয়ং এ তিনি উঠলেন ক্ল্যারেনডন হোটেল-এ। এটি তৈরি করেছিলেন আসাম অঞ্চলে চা শিল্পপতিদের অন্যতম জেমস হোয়াইট। ১৯২২ সালের বিবরণে দেখা যায় ক্ল্যারেনডন হোটেলটি তখনও বাহাল তবিয়তেই ছিল। এখন এর কি অবস্থা তা আমার জানা নেই।

এর কিছুকাল পর ক্ষুদে রেলপথ টুং পর্যন্ত গেল, আর ১৮৮১ সালের ৪ঠা জুলাই হল সেই স্মরণীয় দিন যেদিন ক্ষুদে রেলপথ দার্জিলিং পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। আর সেই দিন থেকেই দার্জিলিং-এর মত শিলিগুড়িরও প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল।

আমাদের বাঙালী বড়লোক এবং উচ্চ মধ্যবিত্তদের কাছেও তখন ইংরেজদের তৈরি শহর দার্জিলিং আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

১৯১৩ সাল। আমার পিতা পরিমল গোস্বামী ১৯১৩ সালে—তাঁর তখন ১৬ বছর বয়স, তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু দুজনে মিলে হঠাৎ চলে গেলেন শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি, আমার পিতৃদেবের মতে তখন খুবই অবনত জায়গা, কেননা, সেই সময় রেল প্ল্যাটফর্মের উপর বিনা পাহারায় গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ রেখে বেশ কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র ঘুরে এসেও তাঁরা দেখলেন ব্যাগ অক্ষত অবস্থাতেই রয়েছে! তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে পরে লিখেছেন :

"পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, এবং ভেবে অবাক হয়েছি! শিলিগুড়িকে এজন্য প্রশংসা করছিনা, কেননা শিলিগুড়ি ১৯১৩ সনে যে কত অবনত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে। সে সময় শূন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ চুরি করার মতো লোকও সেখানে ছিলনা। চোর তো ছিলই না, এমন সুযোগ পেলে সাময়িকভাবে চোর হয়ে উঠবে এমন সাধুও সেখানে ছিলনা।"

১৯১৩ সালেও ইস্টার্ন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে প্রকাশিত একটি বইতে শিলিগুড়িকে গ্রাম বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৩৯ সালে অবশ্য শিলিগুড়ি বেশ বর্ধিষ্ণু। পিতা লিখছেন, "কিন্তু ১৯৩৯-এর শিলিগুড়ি দেখি লোকে ঠাসা। এখন প্ল্যাটফর্মে অরক্ষিত অবস্থায় একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ফেলে যেতে বোধ হয় এক বছরের শিশুও রাজি হবে না। এবারে যখন আমরা ছোট্ট ট্রেনে উঠে এগিয়ে চলেছি তখন মনে হল যেন এ এক সম্পূর্ণ পৃথক শহর, এত লোকের ভীড়, এত বিস্তৃত বাজার।"

ক্ষুদে গাড়ি সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "গাড়িগুলো খুবই ছোট, কত ছোট তা না দেখলে কল্পনা করাই শক্ত। হঠাৎ দেখলে খেলার গাড়ি মনে হয়, যেন 'মেকানো' সেট। দুখানা রেল মাত্র ২৪ ইঞ্চি ব্যবধানে পাতা। দার্জিলিং যাবার পথে এই রেলগাড়ি ও রেলপথও কম আকর্ষণীয় নয়। হিমালয়ের সঙ্গে এর স্মৃতিও আমার মনে বাল্যকাল থেকে গাঁথা। এ যেন হিমালয়েরই একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। সে জন্য মোটরে দার্জিলিং যাওয়া আমার কাছে রুচিকর বোধ হয়না।"

আমরা এখন শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে চলেছি শুকনার দিকে।
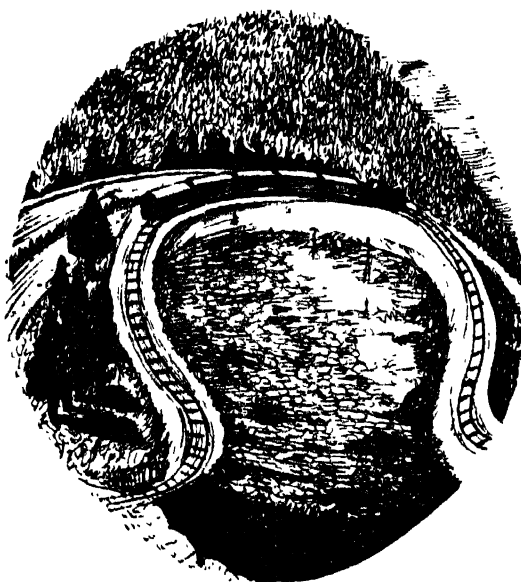
ক্ষুদে রেলগাড়ি উপরে উঠছে

তরাই অঞ্চল দিয়ে ক্ষুদে রেলগাড়ি চলেছে। গাড়ির ভাড়া সামান্য। কয়েক টাকা মাত্র। ১৮৪৮ সালে অবশ্য শিলিগুড়ি পর্যন্ত আসতেই হুকার সাহেবের কাছ থেকে বেয়ারারা ২৪০ টাকা আদায় করেছিল। এর উপরও আদায় করেছিল বকশিস! সে আমলে ঐ টাকা যে খুবই অসামান্য ছিল তাতে আর সন্দেহ কি। লোকেরা ডাকগাড়িতে চড়েও পথভ্রমে বিশেষভাবে ক্লান্ত হতেন। ক্লান্ত হওয়ার কথাই। রাস্তার অবস্থা যাই হক না কেন, সাধারণত গ্রীষ্মকালেই এই পথপরিক্রমা, অর্থাৎ নদী পার হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যেতে লাগত ছটি পুরোদিন। এটা কিভাবে করা হত তা একটু দেখা যাক। সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে গঙ্গা পার হয়ে কারাগোলা। তারপর ডিংরা ঘাটে পৌঁছে পূর্ণিয়া, কিষেনগঞ্জ, তিতালিয়া, শিলিগুড়ি পর্যন্ত গরুরগাড়ি কিংবা পালকিতে। পালকিতে সময় লাগত ছটি দিন, গরুর গাড়িতে আরও বেশি। নেহাত দায়ে না পড়লে এ পথ কেউ বিশেষ ধরতেন না। এর কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে।

এবার শিলিগুড়ির ৩৯২ ফুট থেকে দার্জিলিং-এর ৬৮১২ ফুট যাত্রা। শিলিগুড়ি থেকে শুকনা ২৮১ ফুটে ১ ফুট উঁচু হতে থাকে রাস্তা। এটা এমন কিছু নয়, শুকনা থেকে ঘুম ৩০ ফুটে ১ ফুট এবং ঘুম থেকে দার্জিলিং ৩৬ ফুটে ১ ফুট। ট্রেনের পক্ষে এ বেশ উঁচুই বটে। অবশ্য সোনাদা থেকে ঘুম উঁচুর দিকে তারপর কিছুটা নিচুর দিকে কয়েক মাইল গেলেই দার্জিলিং। ঘুম স্টেশন ৭৪০৭ ফুট উঁচুতে। অনেকের ধারণা এত উঁচুতে পৃথিবীর আর কোথাও নাকি রেলগাড়ি চলেনা। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়—এর চেয়ে অনেক উঁচুতে রেলপথ এই পৃথিবীতেই রয়েছে—যদিও জায়গাটা আমাদের কাছাকাছি মোটেই নয়। জায়গাটা হল পেরুতে। পেরুর ক্যালাও থেকে লিমা হয়ে হুয়ানচাইও পর্যন্ত। এই পথের ১০৭ মাইল পাহাড়ী পথে ট্রেন উঠে যায় ১৫৮০৬ ফুট পর্যন্ত, অর্থাৎ ঘুম যত উঁচু রেলপথের উচ্চতম স্থান ঘুমের চাইতে দ্বিগুণের বেশি উঁচুতে। বলা হয় রেলওয়ে ইনজিনিয়ারিংএ এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার।

আবার বইতে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকেও রেল ইনজিনিয়ারিংএর একটা আশ্চর্য ব্যাপার বলেই বহু জায়গায়—তা সরকারই হোক, বা বেসরকারিই হোক, পড়েছি। এই রেলপথ তৈরির ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সার অ্যাশলে ইডেন এবং সার ফ্র্যানকলিন প্রিষ্টেজ। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের প্রথম ম্যানেজার। এই রাস্তা তৈরিতে দুরকম খরচ পড়েছিল, প্রথম খরচ ছিল রাস্তা বানানোর, মাইল প্রতি খরচ পড়েছিল ৯০ হাজার টাকা, বা ৬ হাজার পাউণ্ড। তারপর এই রাস্তার উপর রেলপথ বসানোর খরচ পড়েছিল মাইল প্রতি ৫২ হাজার টাকা, বা সাড়ে ৩ হাজার পাউণ্ড। আগে অবশ্য হিসেবে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল মাইল প্রতি ৩ হাজার পাউণ্ড, বা ৪৫ হাজার টাকা। তা সরকারী এসটিমেট এবং আসল খরচে চিরকালই ফারাক থেকে যায়। যাক সে কথা।

কথা হচ্ছিল দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের ইনজিনিয়ারিং নিয়ে। এমন আশ্চর্য কাণ্ড নাকি কদাচিৎ ঘটে এমন কথা অনেক বলা বা লেখা হলেও ১৯০৭ সালে প্রকাশিত এল এম এস ও'মাল্লি সম্পাদিত বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, দার্জিলিং-এ এবিষয়ে লেখা হয়েছিল, দার্জিলিং রেলপথের ইনজিনিয়ারিং খুব আশ্চর্য কাণ্ড-কারখানা বলা যায়না। পথ তো তৈরিই ছিল, তার উপর রেল

লাইন বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এটা দেখতে হয়েছিল বাঁকের কাছে বা উঁচুতে উঠবার জায়গাগুলো ট্রেন চলাচলের উপযোগী কিনা। এটার জন্য কিছুটা দক্ষতার দরকার হয়েছিল ঠিকই। এর মধ্যে একটাও সুড়ঙ্গ করতে হয়নি, যা বাধা ছিল তার সঙ্গে ইনজিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক তেমন ছিলনা। তবে এও ঠিক, প্রায় একশো বছর হয়ে এল, এখনও ঐ একই লাইনে রেল চলছে, মাঝে মাঝে ধস নামায় অবশ্য লাইনের সামান্য এদিক-ওদিক করতে হয়েছে। সে হিসেবে যাঁরা ঐ রেল তৈরি করেছিলেন তাঁদের প্রশংসা করতেই হয়।

একটা দুটো ইনজিনিয়ারিং সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছিল, সেগুলোর কথা উপরে উঠতে উঠতে যথাস্থানে বলা যাবে।

আমরা এখন শুকনায় এসে পৌঁছেছি। শিলিগুড়ি থেকে জায়গাটা প্রায় ৭ মাইল এবং যদিও শিলিগুড়ি থেকে শুকনা কিছু উঁচুতে, তবু চলবার সময় তা ঠাহর করা যায়না। ২৮১ ফুট চলতে চলতে এক ফুট উপরে ওঠা প্রায় সমতল-ভূমিতে চলারই মত। শুকনার উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে [illegible]৩ ফুট উঁচুতে। আমাদের ইতিমধ্যে মহানদী পাড় হতে হয়েছে। এবারে রেলগাড়ি সত্যিকারের পাহাড়ী পথে উঠবে। এ পর্যন্ত আমরা এসেছি চায়ের বাগান আর ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে। আর যখন-ই উঁচুর দিকে উঠছি তখনি দুধারে ঘন শালের জঙ্গল চোখে পড়ছে। আরও উঠবার আগে একটা কথা এখানে বলে নেওয়া যাক। আজকাল এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বুনো জন্তুজানোয়ার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এই ট্রেন যখন প্রথম চালু হয় এবং তারপর আরও ত্রিশ-চল্লিশ বছর এদিকে প্রচুর বন্য জীবজন্তুর দেখা মিলত। ১৯০০ সালে এই শুকনা স্টেশনের সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি রেল প্ল্যাটফরমের উপর এক শীতের সকালে দেখা গেল একটা বাঘ ঘুমিয়ে রয়েছে। তার মুখ টিকিটঘরের জানালার দিকে। তখন জায়গাটা জনবিরল। হয়ত বাঘমশাই ভাবছিলেন, ধুর ছাই এমন দেশে মানুষে থাকে! বলে প্ল্যাটফরমে শুয়েছিলেন, সম্ভবত ট্রেনেরই অপেক্ষায়। কিন্তু তার ভাগ্য সেদিন ভাল ছিলনা। কাছেই জুটে গেলেন এক শিকারী। ঐ শিকারী দেখালেন কীভাবে একটি বাঘকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করতে হয়। তখনকার সময় শিকারীকে নিশ্চয় বীরত্বের জন্য খাতির করা হয়েছিল। আজকাল অবশ্যই প্ল্যাটফর্মে বাঘ পাওয়া অসম্ভব এবং কোনো শিকারী ঐ বাঘকে মারলে

তার প্রথম কাজ হবে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুতবেগে পলায়ন, কেননা, মানুষখেকো না হলে আজকাল কোনো বাঘকেই মারা যায়না।

১৯১৫ সাল। তখন ইউরোপে কামান, মেশিনগান শান্তি খণ্ড খণ্ড করে চলেছে। এই শুকনা স্টেশনে সে সবের কোনো চিহ্ন নেই। শুকনা থেকে দার্জিলিং-এর পথের প্রথম কালভার্টটার নিচে কিছু খাদ্যের অপেক্ষায় বসে ছিল এক বাঘ কিংবা এও হতে পারে, কোথাও সে বেশ কিছু খেয়ে-দেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর ঘুমুতে ঘুমুতেই তার খিদে পেয়েছিল। এই সময় তার ঘুম ভেঙে যায় এবং তার চোখে পড়ে দিব্যি একজন ভারতীয় 'ব্রেকফাস্ট' দুটি পায়ের সাহায্যে ধীরে ধীরে তারই দিকে আসছে। এর চেয়ে ভাল কিছু পাবে বাঘ স্বপ্নেও ভাবেনি। বাঘ তখন "সুস্বাগতম্" বলে এক হাঁক দিয়ে 'ব্রেকফাস্ট'-এর দিকে তেড়ে যেতেই 'ব্রেকফাস্ট' হুড়মুড় করে দৌড়ে কোনোক্রমে স্টেশনে এসে সেবারকার মত খাদ্য হওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিল। আর তখন তার যা চেহারা হয়েছিল, সে দেখবার মত! ভয়ে তার মুখ সাদা, আর হাত পা গা সব কাঁপছে! ঠিক সেই সময়ে একটা ট্রেন আসায় ডজন ডজন যাত্রী তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে— সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। সেদিন বাঘটা মনে মনে হয়ত বলছিল, খাদ্যটা আমার মুখের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ এমন মত বদলে ফেলল কেন?

এই বাঘের কথা বলেছেন ডোরজি, ১৯২২ সালে প্রকাশিত দার্জিলিং বিষয়ে লেখা একটা বইতে। শুকনার কাছে ফরেস্ট বাংলোর ঠিক সামনে তিনি নিজেও একটি বাঘ দেখেছিলেন ১৯১৫ সালে। বাঘের তখন ঝোপে-ঝাড়ে থাকার সম্ভাবনা সত্যিই ছিল, কেননা, অনুমান করা হয় ভারতবর্ষে তখন হাজার চল্লিশেক বাঘ ছিল। বর্তমানে যে তাদের দেখা পাওয়া দুষ্কর তার কারণ তারা সংখ্যায় এখন প্রায় দু হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যা বাড়ানোর জোর চেষ্টা চলছে, চেষ্টা চলছে জঙ্গল যাতে শেষ না হয়ে যায় তারও। এই উত্তরবঙ্গেই তিনটি সংরক্ষিত জঙ্গল রয়েছে। এসব জায়গায় কোনো রকম বন্য পশু হত্যা নিষিদ্ধ। এগুলি হল গোরুমারা, হলং এবং জলদাপাড়া। যাঁরা দার্জিলিং-এর ট্রেনে উঠে বসেছেন, তাঁদের বলি, নামবার সময় নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেই শেয়ালদা বা হাওড়ার ট্রেন না ধরে দিন কয়েক উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে ঘুরতে পারলে ঘুরে যান।

শুকনা পর্যন্ত পথের দুধারে মানুষের চাষ করা ধান এবং চা ছাড়াও রয়েছে কিছু কিছু শাল, এর ইংরাজি নাম Shorea Robusta, নাম ঠিক ইংরাজি নয় ল্যাটিন। এবার থেকে আমাদের ইংরাজিরই শরণাপন্ন হতে হবে—যেমন Dillena pentagyna, Bhutea frondosa, Termenlia Tomentosa, এবং সাভানা ঘাষ। কয়েক ধরনের পাম, এবং লতা গাছ। ১৯২২ সালের বর্ণনায় দেখি পথের ডান ধারে মোহরগঞ্জ টি এসটেট। এর চার ধারে রয়েছে বিশাল আকারের এলিফ্যান্ট গ্র্যাস। গাছের তলায় গাছ—ইংরাজিতে বলা হয় আণ্ডার গ্রোথ, প্রচুর বেত। এখানে বাঘ তো থাকতই, আর থাকত প্যান্থার, হাতি, মোষ, বাইসন এবং হরিণ।

এ সবই শিলিগুড়ির কয়েক মাইলের মধ্যে। আজ নিশ্চয়ই এই অঞ্চলে বাঘ নেই। থাকলেও কালে ভদ্রে তার সাক্ষাৎ ঘটতে পারে। প্যান্থার কিছু হয়ত আছে, মোষ আছে। ১৯৭৭ এও বাইসনের হদিশ পাওয়া গেছে। হরিণের দেখা এখনও মেলে, তবে আগে যেমন দলবদ্ধভাবে তাদের দেখা যেত এখন আর ততটা নয়।

সবুজ প্রকৃতি কৃপনা হতে হতে চলেছেন। আর পঞ্চাশ বছর পর, ভারতের লোকসংখ্যা তিনগুণ বা আরও বেশি হলে শিলিগুড়ি শহর আরও বড় হলে এসব অঞ্চলে একটা বাঘ হরিণ কেন, একটা শেয়ালেরও দেখা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যে শেয়াল সম্পর্কে প্রকৃতিবিদ কৃষ্ণান বলেছেন, তাদের সংখ্যা সমস্ত ভারতবর্ষেই কমে এসেছে। এরকম পরিস্থিতি চিন্তাও করা যায় না—কেননা, ওর অর্থ মানুষের অস্তিত্বই লোপ হওয়া।

ডোরজি লিখছেন, এর পরের বছর মার্চ-এ, অর্থাৎ কিনা ১৯২৬ সালে, তিনি স্পষ্ট দেখেছেন দুপুর একটা নাগাদ একটা ডোরাকাটা বাঘ লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বিচরণরত এক গরুর দিকে। কিন্তু এদিকে মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে বা অন্য কোন কারণে বাঘ সঙ্গে সঙ্গে স্থান ত্যাগ করায় ঐ বাঘের সেদিন ফলার জোটেনি। সে দিন বাঘকে কী খেয়ে কাটাতে হয়েছিল কে জানে।

আবার এই শুকনা ষ্টেশনেরই কাছে ক্ষুদে ট্রেনটিকে পিছিয়ে পিছিয়ে ষ্টেশনেই ফিরে আসতে হয়েছিল একদা। কেননা লাইনের উপর ছিল এক পাল বুনো হাতি। ষ্টেশনের কর্মচারীরা সেদিন খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ঐ হাতিরা রেল

লাইন দেখতে এসেছিল বলে মনে হয়, এবং ঐ লাইন বোধহয় তাদের মোটেই পছন্দ হয়নি। কারণ তারা বুঝেছিল সাম্রাজ্য তাদের হাতছাড়া হতে চলেছে। তাই তারা সেদিন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে জড়ো হয়েছিল এবং লাইন ছাড়তে সহজে রাজি হয়নি। ১৯১৬ সালেরই কথা—এবারে ওকলি নামে এক ড্রাইভার দার্জিলিং থেকে ক্ষুদে ট্রেন নিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পান সামনে লাইনের উপর তিন তিনটি হাতি। তাদের মধ্যে একটা পুরুষ। তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ট্রেনের হুইস্‌ল বাজানোয় কোন কাজ হয়নি। তাতে ঐ পুরুষ হাতিটা রেগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মাইলপোস্টটা মাটি থেকে তুলে ফেলে দেয়। আর তাতেও যখন তার রাগ যায় না তখন সে উচিৎ শাস্তি দেওয়ার জন্য গাড়ির দিকে ধেয়ে যায়। ড্রাইভার তখন উপস্থিত বুদ্ধি না হারিয়ে ইনজিন থেকে দ্রুত ষ্টীম ছাড়তে থাকে। বাস্! ওতেই কাজ হয়। তিনটি হাতিই তখন দুরদার করে জঙ্গল ভেঙে অসম্ভব দ্রুত বেগে পালিয়ে যায়। এখনও এই অঞ্চলে হাতির সংখ্যা প্রচুর— তবে প্রায়ই তাদের যে ভাবে হত্যা করা হচ্ছে বলে মাঝে মধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছে তাতে মনে হয় উত্তরবঙ্গে হাতিদের অবস্থা দাঁড়াবে মরিশাসের ডোডোর মতোই।

এই অঞ্চলে বাইসনের সন্ধান এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ৯৪১ এর একটি বর্ণনায় জানা যায় এই অঞ্চলে এক শিকারী বিরাট একটা বাইসনকে গুলি করে, কিন্তু তাতে সে না মরে কেবল আহত হয়। আহত হয়ে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দৌড়তে থাকে, আর শুকনা ষ্টেশনের কাছে একটা ক্ষুদে ট্রেন আস্তে আস্তে আসছিল। ঐ বিরাট বাইসনটি আহত হয়ে এমনই উন্মত্ত হয়ে ছুটছিল যে সামনে এসে পড়া ট্রেনটিও তার চোখে পড়েনি। কিংবা চোখে পড়েছিল, কিন্তু সেটাকে সে মনে করেছিল বিরাট এক কোনো জন্তু, এবং তাকে শত্রু বলেই তার মনে হয়েছিল। বাইসনটির সঙ্গে সেবার কোনো সংঘর্ষ হয়নি, সেটা অবশ্য দৈবাৎ ঘটেছিল, কেননা ড্রাইভার গুহ কিংবা ঐ বাইসন, কারুরই সংঘর্ষ এড়াবার সাধ্য ছিল না। সাধারণ বাইসনেরা হাতিদের মতই দলবদ্ধ থাকে। সেদিন ঐ একটি বাইসন থাকাতেই ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়নি। যদি তারা সংখ্যায় একদল থাকত তাহলে সেদিন একটা বিরাট দুর্ঘটনা যে ঘটত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

এই অঞ্চলে জীবজন্তুর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য জন্তু বাদ পড়ে গেছে। এটা হল ময়াল সাপ, যদিও এটিকে জন্তু বলা ঠিক উচিত হবে না! ১৯৫১ সালে শুকনা

থেকে কিছু দূরে এক চা বাগানের কাছে একটা ময়াল সাপ হরিণ গিলেছিল, এবং তা নিয়ে ঐ অঞ্চলে খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। দেখবার ইচ্ছে থাকা সত্বেও সাত মাইল হেঁটে যাওয়া এবং আসার ভয়ে সেবার আমরা ঐ দৃশ্যটি দেখতে পারিনি। এখনও ঐ অঞ্চলে ময়াল সাপ রয়েছে—কিন্তু তারা কি খেয়ে জীবন ধারণ করে তা জানা নেই—কেননা, এ অঞ্চল থেকে হরিণ ক্রমশই অন্তর্হিত হচ্ছে, এমন কি খরগোশও।

ক্ষুদে ট্রেনের বাঁ দিকে বসুন

ক্ষুদে ট্রেন ৩৫ টন পর্যন্ত টানতে পারে। যাত্রি সংখ্যা বেশি হওয়ার ফলে ট্রেনটিকে দু ভাগে ভাগ করে দুটি ইনজিন দিয়ে চালানো হয়। বাইরের দৃশ্য ভাল করে দেখতে হলে, ডোরজি বলছেন, দার্জিলিং-এ যাওয়ার পথে ট্রেনের বাঁ দিকের সীটে বসুন। তিনি বলছেন, তাতে তিনটে সুবিধে—প্রথমতঃ সকালের সূর্যের আলোর হাত থেকে তাহলে বাঁচা যায়। সূর্যের আলো সকালের হলেও বেশ জালানর ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়তঃ প্রায় সমস্ত যাত্রা পথে উঁচুতে উঠতে উঠতে নিচের সমতল ভূমি চোখে পড়তে পড়তে চলে। তৃতীয়তঃ বাঁ দিকে বসলে মাথা ঘোরা তেমন মালুম হয় না। ডোরজি বলছেন, পাহাড়ে উঠবার আগে দু চারটে দাওয়াই সঙ্গে নিলে ভাল হয়, যেমন অ্যাসপিরিন, অথবা ফেনামেটিন, সঙ্গে একটু একটু করে ব্র্যানডি। এতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ না হলেও একটু

আরাম হবে যে তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা তরল বস্তুর ভক্ত, তাঁরা হয়ত বলবেন, একটু একটু করে নয়। একটু মাত্রা বাড়িয়ে যদি ব্র্যাণ্ডি পান করা যায় তাহলে অন্য কোনো দাওয়াই এরই দরকার হয় না! ডোরজি অবশ্য, এই সঙ্গে হোমিওপ্যাথি দাওয়াই-এর কথাও বলছেন। তিনি বলেছেন, ট্রেন যখন ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে থাকে তখন মাথা ঘোরে, বমি বমি ভাব হয়—এর জন্য হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। ভ্রমণ শুরু করার একদিন আগে pecacuanha 200র এক ডোজ খেয়ে নিতে হবে, আর যাঁরা এই রোগে একটু বেশি মাত্রায় ভোগেন তাঁরা ট্রেনে ওঠার আগে এক ফোঁটা খেয়ে নিতে পারেন। এ ছাড়া ট্রেন যখন চলছে তখন coculus 6 দু ফোঁটা, কিংবা গ্লোবিউল, যার যেমন ইচ্ছে। আমরা অবশ্য দেখেছি যাঁরা কলকাতার ট্রামে বাসে চড়ে অভ্যস্ত তাঁদের মাথা এই সব ঘোরালো পথে মোটেই ঘোরে না!

এর পরের পথটুকু সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা ব্যক্তি মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছেন। ক্রমশ উঁচুতে উঠতে ক্রমাগত দৃশ্য পরিবর্তিত হতে থাকে। এমন আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা মনের মধ্যে ঘটতে থাকে যে তা ভাল করে গ্রহণ করার আগেই অন্য এক আশ্চর্য দৃশ্য এসে উপস্থিত হয়। ধীর গতি ট্রেনও—যার ঘণ্টায় ১০ মাইলের বেশি যাওয়ার হুকুম নেই, মনে হয় দ্রুতগতি। মনে হয় ট্রেন আরও আস্তে চললে যেন বেশি ভাল হত! কবি সতীশ ঘটকের লেখা হঠাৎ মনে পড়ে :

ফুটে ওঠে ছবি পথের দু'ধারে
ডুবে মুছে যায় কাল পারাবারে
অনলস বায়ু দ্রুত সঞ্চারে
সঞ্চরয়
বাতাস বয়।

পথ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। সাপের মত, "after the manner of a serpent" আর যেতে যেতে কখনও পাশের পাথরে চোখ বেধে যায়। কখনো ডান দিকে চোখে পড়ে ইনজিন, কখনো বাঁ দিকে। কখনো মনে হয় ট্রেন যেন শূন্যে ঝুলছে, এবং এক মুহূর্তেই পড়ে যাবে নিচে। এবারে খেয়াল করলে দেখা যাবে গাছ-

গাছালির রূপ ও রঙ বদলে বদলে যাচ্ছে। সমতল ক্ষেত্রে যে সব গাছ হামেসা চোখে পড়ত সেগুলো এখন আর প্রায় চোখে পড়ছে না। আস্তে আস্তে স্থান নিচ্ছে অন্য জাতের অন্য বংশের সব গাছপালা, ফুল ইত্যাদি। বাংলার সমতলে সবই ছিল সবুজ। একটানা সবুজের সমারোহ। প্রমথ চৌধুরী লিখছেন, একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হতে সুন্দরবন পর্যন্ত এক টানা সবুজ বর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে! কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই। শুধু তাই নয়, সেই রঙ বাংলার সীমানা অতিক্রম করে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত।

কথাটার মধ্যে যেমন সত্যও আছে, আছে কিছু অতিরঞ্জনও! ওটা প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল। সবুজ বলতে একটা রঙ বোঝায় না, একরকম সবুজ এক মাঠ ঘাসের মধ্যেও পাওয়া দুষ্কর। মাঠে, ঘাটে, এখানে-ওখানে বাংলাদেশে নিশ্চয় সবুজ প্রাধান্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাদাও অনেক রয়েছে, রয়েছে অন্য রঙও। আমার মনে হয়েছে হিমালয়ের উপরে উঠতে উঠতে সবুজটা গাঢ় থেকে আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে। বিশেষ করে আমাদের সুপরিচিত বাঁশগাছের কথা ধরা যাক। এই বাঁশ পূর্ববঙ্গে যেমন, পাহাড়ে তেমন নয়। আকারে এবং চরিত্রে বাঁশ ঠিকই, কিন্তু পাহাড়ী বাঁশ অনেক হালকা এবং সবুজের ভাগ কম। এছাড়া গাঁটগুলোও পাহাড়ী বাঁশে সমতল বাঁশের মত ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। তাছাড়া, প্রমথ চৌধুরী এই লেখার মধ্যে এমন একটা কথা বলে ফেলেছেন যা টেক্‌নিক্যালি সত্য নয়। অর্থাৎ তরাই-এর সীমান্ত পেরিয়ে উত্তরে হিমালয়ে উঠলে তাও বাংলাদেশেরই অন্তর্ভুক্ত! এটা ঠিক, তরাই-এর সীমান্ত পেরিয়ে ভুটান রাজ্যও রয়েছে, কিন্তু আমরা যে তরাই কাছে পাচ্ছি সেটাকে ধরলে তার ভেতর দিয়ে যে হিমালয়ে প্রবেশ করছি তাও বাংলারই অন্তর্ভুক্ত! তবে কি শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী ভুল করেছেন? আগেই বলেছি, এটা তাঁর টেকনিক্যাল ভুল। আসলে ব্যাপারটা সহজ। হিমালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগকেই মেলানো যায় না। আগে বঙ্গের এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের অংশ হয়েও হিমালয় অন্য এক জগত। বাঙালীর মনের সঙ্গে এর সখ্যতা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মিলে-মিশে এক হয়ে যায়নি। এই কারণেই হিমালয়ের শুরুতেই প্রমথ চৌধুরীর মনে

এসে গিয়েছিল বাংলার সীমান্ত। বাংলার মনের সঙ্গে পাহাড়ের বিস্ময়কে মেলানো যায়, কিন্তু প্রেমের নিদর্শন তেমন মেলেনা। যা মেলে তা চিরস্থায়ী নয়, সাময়িক। এর কারণও সহজ। প্রাকৃতিক বাধা বড় বাধা। আজ পুরুলিয়া, মালদহ বা শিলিগুড়িতে যাওয়ার কথা হলে আমি ততটা ভাবিনা যতটা ভাবি দার্জিলিং, কার্শিয়ং বা শিলং যাওয়ার কথায়। প্রথমেই ভেবে নিই, তাই তো গরম পোশাক আছে তো? এগারো বছর আগেকার করানো উলের জ্যাকেটটা পোকায় খায়নি তো? আর টুইডের যে ট্রাউজারজোড়া ছিল সেটাকে 'অলটার' করাতে হবেনা তো? তার স্টাইলটা বোধ হয় পুরনো হয়ে গিয়েছে? আর মাফলার যদি বা খুঁজে পাওয়া যাবে দস্তানাজোড়া তো আর নেই। সেই কবে আমার বন্ধুর কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন, এখনও ফেরত দেননি। অবশ্য তাঁর দোষ নেই, আমিই বলেছি এখন থাক না, দস্তানা তো আর হামেশা দরকার হচ্ছেনা?

জুতোও নতুন একজোড়া কিনতে হবে। কলকাতায় তো চপ্পল পরেই কাটিয়ে দেওয়া যায়, দিইও। আর বড় হাতওয়ালা উল মেশানো গেঞ্জি? ওরকম দুটো দরকার—বলা যায় না, কখন ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

গ্রীষ্মকালেও যখন পাহাড়ের উপর ঠাণ্ডা, তখন সেজন্য বিশেষ করে প্রস্তুতির কথা ভাবতেই হয়। আর শীতকালে তো কেউ দার্জিলিং বা ঐ রকম পাহাড়ী জায়গায় যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না দু চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া, যেমন ব্যতিক্রম ছিলেন রঞ্জন। তিনি হঠাৎ শীতকালেই দার্জিলিং এ চলে গিয়েছিলেন, এবং তাই নিয়ে লিখে ফেলেছিলেন একখানা বইও—শীতে উপেক্ষিতা। আসলে বইখানায় দার্জিলিং এর তেমন বর্ণনা ছিল না, যেমন ছিল এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। তাও খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। অতিরিক্ত রোমান্টিকতা যা ঐ বইখানাকে তৎকালে জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেটাই ছিল বইখানার প্রধান বিষয়। তবে রঞ্জন এর পর আর কোনো বড় আখ্যান লিখতে যাননি। যতদূর শুনেছি তিনি নিজেও শীতে উপেক্ষিতার উল্লেখে লজ্জিত হতেন।

শীত। দার্জিলিং মানেই ঠাণ্ডা। এ তো অনেক আগে থেকেই আমাদের দার্জিলিং থেকে সরিয়ে রেখেছে। দার্জিলিং মানেই বিশেষ প্রস্তুতি। দার্জিলিং মানেই থার্মোমিটার, আবহাওয়া নিয়ে আগ্রহী আলোচনা। কুয়াসা? ঠাণ্ডা?

মেঘ? সর্দি কাশি? মাথা ঘুরুনী? পায়ে ব্যথা? দার্জিলিং মানেই আলাদা একটা জগত।

দার্জিলিং-এ গরমকালে ঠাণ্ডা। সঙ্গে কি নিতে হবে? এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং যাত্রা নিয়ে লেখা চিঠি স্মরনীয়:

> গাড়ি চলতে লাগল। ক্রমে ঠাণ্ডা, তারপরে
> মেঘ, তারপরে সর্দি, তারপরে হাঁচি, তার
> পরে শাল কম্বল বালাপোষ, মোটা
> মোজা পা কন্‌কন্‌, হাত ঠাণ্ডা, মুখ
> নীল, গলা ভার ভার এবং ঠিক তার পরেই
> দার্জিলিং।

ডোরজি বলছেন, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য নিতে হবে ধুলো নিবারক পোশাক। শেয়ালদা স্টেশন ছাড়ার পর থেকেই যার দরকার হবে।

জিনিসপত্র তখন কম নেওয়া হতনা। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাতেই পাওয়া যায়, "...আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি, মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিসপত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্য বিবিধ বন্দোবস্ত করা..."

রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা দিয়েছেন ১৮৮৭ সালে। কয়েক বছর হল দার্জিলিং পর্যন্ত রেলে যাওয়া যাচ্ছে। বর্তমান শতাব্দীর সম্ভবতঃ গোড়ার দিকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানীতে: "...ওরে টেলিস্কোপটা নিয়ে যেতে ভুলিসনে। সেটা কোথায় গেল দেখতো!"

পুরণো বই-এর আলমারিতে সারি দেওয়া বই-এর পিছনে পড়েছিল চামড়ার খাপে মোড়া বহুদিনের দূরবীনটা। দাদামশায় সেটাকে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলেন।

এটাকে নিয়ে যেতে হবে দার্জিলিং-এ।

দার্জিলিং যাবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দাদামশায় এটা বাছছেন ওটা বাছছেন। রঙ তুলি কাগজ বোর্ড লাঠি আর ঐ টেলিস্কোপ।

পাহাড়ে অনেক দূরে চোখ চলে। দূরবীন না হলে চলে ?

রীতিমত লটবহর নিয়ে তবে দার্জিলিং যাওয়া। গোছগাছ করতে কদিন চলে গেল। নীল রং-এর ডোরাকাটা বড় বড় শতরঞ্চি মুড়ে ঢাউস ঢাউস বিছানা বাঁধা হল। পেটমোটা কাঠের সিন্দুকে বাসন-কোসন। টিনের আর চামড়ার ট্রাঙ্ক-সুটকেশ-এ গরম কাপড় জুতো মোজা গেঞ্জি। আর ঝুরিভরা খাবার রাস্তায় খাবার জন্যে।···

আজকাল লটবহর আর তেমন নিতে হয়না, কিন্তু তবু দার্জিলিং যাওয়ার কথাতেই মন অন্যরকম হয়ে যায়, যা পুরী কিংবা বোম্বাই যাওয়ার সময় হয়না।

দার্জিলিং সত্যিই অন্য দেশ।

গাড়ি এল তিনধরিয়ায়
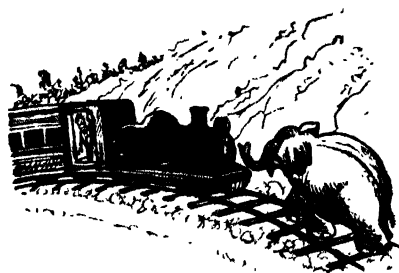
সাধারণতঃ ট্রেনের একদিকে বিরাট শূন্যতা। অন্যদিকে পাথরের দেয়াল। শূন্যতা যেদিকে সেদিকটাই বেশিদূর নজরে চলে। রাস্তার ধারে গাছের ভেতর দিয়ে দূরের আকাশ, নিচের উপত্যকা চোখে পড়ে। কিন্তু পাথরের দেয়াল কম আকর্ষণীয় নয়। পাথরের গায়ে কত রকমের শ্যাওলা, বেয়েওঠা ঘাস, গভীর সবুজ রঙের বিচিত্র রকমের পাতা, সৃষ্টির আদিম যুগের লাইথেন—এক ধরনের শ্যাওলা, কখনও লতানে গোলাপ, কখনো মথ, প্রজাপতি। তাই দেখবার জিনিস

দুদিকেই। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বুনো গোলাপ তুলে নিতে যতখানি আনন্দ ততখানি আনন্দই হয়ত দূরের আঁকা-বাঁকা ঝাপসা নদীগুলিকে দেখে, মেঘের খেলা দেখে। একই সঙ্গে যেন স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতাল! প্রতি মুহূর্তেই দৃশ্যের নাটকীয় পরিবর্তনও ঘটে যাচ্ছে ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে। আরও মজা, আরও নাটক জমছে যেখানে রাস্তার গেরো, বা লুপ এসে যাচ্ছে। প্রথম লুপ-এর দেখা পাওয়া যায় সাড়ে এগারো মাইলের মাথায়। তারপরই আধ মাইল এগিয়ে পড়বে রঙটঙ স্টেশন। নামটা চমৎকার। উচ্চতা ১৪০৪ ফুট। এর পরের গেরো আসবে আরও তিন মাইল পর। এখন জায়গাটিকে দেখে এমন কিছুই মনে হবে না, কিন্তু এরই কাছে, লাইনের বাঁ দিকে ছিল প্যান্থারদের দারুন এক আড্ডা। এখানে রেললাইন তৈরির সময় ফাঁদ পেতে অল্প সময়ের মধ্যে একদা ধরা হয়েছিল ৬০টি প্যান্থার! দুবার এক সঙ্গে দুটো করে ধরা হয়েছিল। এত সব প্যান্থার—কিন্তু তখন এদের ভয়ঙ্কর পরিণতি হয়েছিল। যাঁরা ফাঁদ পেতে প্যান্থার ধরে ছিলেন তাঁরা তাদের নিয়ে খাঁচায় করে নানা দেশের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেননি। তাঁরা দারুণ বীরত্বের কাজ করেছিলেন। সেই সব ধরা পড়া প্যান্থাররা একে একে গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল সেই জঙ্গলে। সেখানে মানুষ সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিল জঙ্গলের রাজত্ব। প্যান্থারদের হত্যা করা কেন হয়েছিল? কারণ, তারা ধরা পড়ে ছিল। অপরাধ ছিল একটিই।

তৃতীয় গেরো আসবে সাড়ে পনের মাইল পর। এই গেরোর পর ট্রেন আসবে দু হাজার ফুট উঁচু চুনাভাটি ষ্টেশনে। ডানদিকের জানালা দিয়ে আগে চোখে পড়ত পুরনো দিনের ডাক বাংলো। এই ডাক বাংলোয় বিশ্রাম নিতেন সেকালে যাঁরা টাঙ্গায় চড়ে যেতেন। এখানেই ব্যবস্থা করা হত মধ্যাহ্ন ভোজের। এর পর জিগ-জ্যাগ।

অল্প জায়গায় ট্রেনকে উঁচুতে তোলার বা নামানোর অপূর্ব কৌশলকে বলা হয় জিগ-জ্যাগ, বা আঁকাবাঁকা। দূর থেকে ট্রেন লাইনকে দেখলে মনে হবে যেন একটা ইংরাজি অক্ষর জেড। এই 'জেড' এর সাহায্যে ট্রেনকে তাড়াতাড়ি উঁচুতে তোলার কাজটি কিন্তু সহজে সম্পন্ন হয়নি। গল্প আছে, এক ভারপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার এই পর্যন্ত নকশা মেলাতে মেলাতে এসে হঠাৎ তিনি যেন অথৈ জলে পড়লেন। অনেক মাথা খাটিয়েও তিনি বুঝতে পারলেন না কী ভাবে ট্রেনটিকে

এত অল্প জায়গার মধ্যে এতখানি খাড়াই-এ তোলা যায়। ভাবতে ভাবতে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছে রেললাইন পাতবার জন্য, সে পথ বদলাতে হবে। তা ছাড়া উপায়ই বা কি? এই নিয়ে তিনি যখন মাথা খাটাচ্ছেন তখন তাঁর স্ত্রী পথ বাতলে দিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর স্ত্রী ছিলেন সাধারণ একজন মহিলা, ইনজিনিয়ার স্বামী ছাড়া ইনজিনিয়ারিং-এর সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না! এই মহিলা বললেন, নাচের ঘরে যখন ভীড়ে যুগল ভাবে নাচতে নাচতে কোণা থেকে বেরুনোর জন্য যেমন ঘুরে না গিয়ে পিছিয়ে যাওয়ার বিধান রয়েছে, ঠিক সেই ভাবে ট্রেনটিকেও তো পিছিয়ে নেওয়া যায়?

এটি কি সত্যি ঘটনা! না গল্প!! তা এখন আর জানা যায় না, তবে এটা গল্প হিসেবে মন্দ নয়। আর এটা সত্যি ঘটনাও হতে পারে বৈকি?

এই পথ সম্পর্কে কেইন নামক এক সাহেব লিখেছেন—

প্রতিটি বাঁকে নতুন ধরণের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য উন্মোচিত হয়। পিছনের দিগন্তে বিরাট উর্বর রৌদ্র-স্নাত বাংলার সমতল ক্ষেত্র। নদীগুলি সব পর্বতের খাদ থেকে বেরিয়েছে। ঠিক যেন রুপোলি ফিতের মত দেখাচ্ছে। সামনের দিকে হিমালয় পর্বত শ্রেণীর প্রথম সারির দেখা মিলছে—এদের সারা গায়ে এবং চূড়ায় গাছপালার সমারোহ। সমুদ্র সমতল থেকে পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার ফুট এদের উচ্চতা। রেলগাড়ি উপরের দিকে উঠতে থাকে বাঁশ আর ঘাসের গভীর জঙ্গল ভেদ করে। বেত গাছ পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। দেখে মনে হয় এগুলি যেন ঘোড়ার গাড়ির বিরাট বিরাট চাবুক।…এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে বুনো বাঘ, গণ্ডার, মোষ, ভালুক, সম্বর, হরিণ আর বুনো শুয়োরের আড্ডা। আরও উঁচুতে উঠলে জঙ্গলের ভাবটা কমতে থাকে, তখন বেশির ভাগই বড় বড় গাছ। গাছও কত রকমের। ওক, বট, লজ্জাবতী লতা, বাবলা, ডুমুর, রাবার, তুঁত। এ ছাড়া রয়েছে বাঁশ, ষাট ফুট পর্যন্ত উঁচু। তিন হাজার সাতশো ফুট উঁচুতে উঠলে দেখা মেলে পীচ, বাদাম। জানুয়ারি মাসে এসব গাছ ফুলে ফুলে ভরে যায়।

তিনধরিয়ায় ট্রেন কয়েক মিনিটের জন্য থামে। তিনধরিয়া প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু (২,৮২২ ফুট)। দার্জিলিং হিমালয় রেলপথে এখানেই রেল ইনজিন মেরামতের কারখানা রয়েছে। জায়গাটিতে পর্যটকেরা বিশেষ যান বলে

শোনা যায় না। শিলিগুড়ি থেকে লোক সোজা দার্জিলিং চলে যান। কেউ কেউ অবশ্য কার্শিয়ং-এও নেমে যান। অবশ্য তিনধরিয়ায় যাওয়ার লোকও নিশ্চয় কিছু আছেন। তিনধরিয়াও পাহাড়ী জায়গা, এবং খুব অবাসযোগ্যও নয়। তার প্রমাণ, এখানে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে। এবং লিখেছিলেন গীতাঞ্জলির কয়েকটি 'গীত'। যেমন—

মেনেছি, হার মেনেছি।
ঠেলতে গেছি তোমায় যত
আমায় তত হেনেছি।...(৬৩ নং)

বা,

একটি একটি করে তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতার খানি নূতন বেঁধে তোলো।...(৬৪ নং)

বা,

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি
গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়...(৬৫ নং)

ইত্যাদি আরও কয়েকটি কবিতা। এগুলির কোনটিই এই অঞ্চলকে ব্যক্ত করেনা। হয়ত ৭০ নম্বর কবিতাটি এর ব্যতিক্রম। কিন্তু এতে ঠিক পাহাড়ের কথা নেই, নেই তিনধরিয়া বা তিন পর্বতশ্রেণীর কথাও।

চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজলি তা'র বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়াল রে অঙ্গ আমার,
জড়াল প্রাণে।

"...বৈচিত্র্য পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। ট্রেনের দু পাশে পরিচিত ফুলের মধ্যে অতিকায় ধুতুরা আর গাঁদা ফুল খুবই বেশি দেখা গেল।" পরিমল গোস্বামী লিখেছেন এই পথ সম্পর্কে। তারপর তিনধরিয়া সম্পর্কে বলছেন, "আমরা যে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে এসে পড়েছি তা এই ষ্টেশনে ভালভাবে অনুভব করা যায়।" তিনধরিয়া ছেড়ে কিছু দূর গেলেই আসবে পাগলাঝোরা।

পাগলাঝোরা আগে·ছিল দুরন্ত

তিনধরিয়ার পর গয়াবাড়ি, তারপর জলপ্রপাত পাগলাঝোরা। পাগলাঝোরা আগে·ছিল সত্যিই দুরন্ত—বহুবার দার্জিলিং-যাবার রাস্তা কার্ট রোড পাগলা-ঝোরার পাল্লায় পড়ে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গয়াবাড়ির পর প্রায় দু মাইল

দূর থেকেই স্থানীয় ভাষায় 'গুমটি'র শুরু। আসলে এখানে বড় বড় জিগ-জ্যাগ থাকায় গুমটি ঘরও রয়েছে বেশি। ডোরজি বলছেন এই জিগ-জ্যাগ হচ্ছে…a wonderful piece of engineering, কিন্তু যাঁরা রেল ইনজিনিয়ার তাঁদের কাছে এসব বস্তু খুব একটা 'ওয়াণ্ডারফুল' ব্যাপার নয়। আমাদের কাছে এরকম অভিজ্ঞতা নতুন এবং আমাদের বিস্মিত করে, অতএব এ বিষয়ে খুব একটা কথা না বাড়ানই ভাল।

শিলিগুড়ি থেকে ২৫ মাইল, অর্থাৎ কিনা দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির ঠিক মাঝখানে পাগলাঝোরা ঝরণা। এখন ঝরণা, কিন্তু তাই এক কালে ছিল জলপ্রপাত। আর বর্ষাকালে এরই তাণ্ডব মানুষকে বড়ই বিপদে ফেলত। এর ইতিহাস যেন, মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন—এই দুটি চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অথবা যৌবন এবং বার্ধক্যের কথা মনের মধ্যে ঢুকে মানুষকে চিন্তায় ফেলে।

পাগলাঝোরা সবচেয়ে ভয়ানক কাণ্ড সম্ভবত ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়েছিল। ঐ বছরে ৮০০ ফুট রাস্তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, রেললাইনও তা থেকে বাদ পড়েনি। এ ছাড়া সামনের দিকের একটা বিরাট পাহাড়ই ভেঙে নিচে পড়ে গিয়েছিল। এত ভয়ানক ভাবে ভাঙাচোরা হয়েছিল যে তখন 'গোলমালে ভাই কাজ কি এসো, অন্য পথে হাঁটি' মনোভাব নিয়ে নতুন পথ তৈরির কথাও ভাবা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাগলাঝোরাকে ভেঙে দিয়ে দশ বারোটি ছোট ছোট প্রবাহে ভাগ করে দেওয়ার কথা হয়। কি ভাবে একে শেষ পর্যন্ত পোষ মানানো হয় তা আমার জানা নেই, তবে একে পোষ মানানো হয়েছিল, আর অনেক মানুষ তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কিন্তু সব কিছুই সব মানুষকে স্বস্তি দিতে পারেনা। অনেক মানুষ 'পাগলা'দের ভালবাসে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ঐ রকম একজন। তিনি পাগলাঝোরাকে শান্ত করা হলে দুঃখিত হয়ে লিখলেন :

> তোমরা কি কেউ শুনবেনা গো পাগলাঝোরার দুঃখ গাথা ?
> পাগল বলে কর্বে হেলা ? কর্বে হেলা মর্ম ব্যথা ?
> জন্ম আমার হিম ঔরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
> সিন্ধু নদের সোদর আমি গঙ্গা দিদির পাগল ভাই।

বরফ-মরুর একলা জীবন—ভাল আমার লাগত না রে,
লুকিয়ে উঁকি তাই তো দিতাম নীচের দিকে অন্ধকারে,
সুড় সুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতুহল
গড় গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম,—ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে !

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইকো মোটে,
পাগলাঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে !
লাফিয়ে প'ড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে প'ড়ে উচ্চ হ'তে
চড় চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে নৃত্য ক'রে মত্ত-স্রোতে,—

তরল ধারায় উড়িয়ে ধূলি, জড়িয়ে দিয়ে হাওয়ার জালা,
জটার 'পরে জড়িয়ে নিয়ে বিনি সুতার রাস্তামালা ;
একশো যুগের বনস্পতি,—বাকল-ঝাঁজি সকল গায়,—
মড়মড়িয়ে উপড়ে ফেলে স্রোতের তালে নাচিয়ে তায়,—

গুহার তলে গুমরে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উ'ঠে,
ঐরাবতের বৈরি হয়ে কৃষ্ণমৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ ছিল যোজন জুড়ে ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ ক'রে
অসার প্রাচীর জড় পাহাড়ের কানে মোহনমন্ত্র প'ড়ে—
পরাণ ভরে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দ-ছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্ছি ম'রে মনের দু'খে পূর্বসুখে স্মরণ করে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়ছি ঝ'রে।
চক্রীমানুষ চক্র ধ'রে ছিন্ন ক'রে আমার দেহ
ছড়িয়ে দিলে দিগ্বিদিকে, নাইক দয়া, নাইক স্নেহ !

আমি ছিলাম আমার মতন,—পাহাড়কোলে নির্বিবাদে,
মানুষ ছিল কোন্ সুদূরে—সাধিনি বাদ তাদের সাধে ;

তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ অল্প আয়ু আমায় কিনা বাঁধলে শেষে !
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়তে ব'লে,
শীর্ণ হয়ে যাচ্ছি ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।

আগে আমায় চিন্‌ত যারা বলছে শোনো—'যায়না চেনা !'
বাজবে কবে প্রলয় বিষাণ ?—মুখে আমার উঠছে ফেনা !
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন যে থাকবে আরো ?
রুদ্রতালে নাচব কবে ? তোমরা কেহ বলতে পার ?

পাগলাঝোরার এই বিলাপকে অবশ্যই "ক্ষুদ্র মানুষ অল্প আয়ু" আমল দেয়নি। এই ক্ষুদ্র মানুষ চক্রী মানুষও। পাগলাঝোরা বলছে, আমি ছিলাম আমার মতন —পাহাড় কোলে নির্বিবাদে, মানুষ ছিল কোন্ সুদূরে··· ।

মানুষ প্রকৃতির নিজস্ব রাজ্যে ঢুকে পড়ছে। দিন দিনই প্রকৃতি তার কাছে পরাভূত হচ্ছে। তবে, শেষ পর্যন্ত মানুষ এতে বিজয়ী হয়ে থাকবেনা। মানুষও প্রকৃতির অংশ, কিন্তু বুদ্ধির গুণে মানুষ প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্রও। তাই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে না থেকে জয় করতে চায়। এই জয়ও কিছুটা মঙ্গল-জনক, কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের জয় করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত উলটো ফলই ফলার সম্ভাবনা।

পাগলাঝোরা সম্পর্কে আর কিছু বলবার নেই, পাগলাঝোরার বন্যরূপ আমাদের চোখে আর কখনও পড়বে না, কেননা দার্জিলিং-এ পৌছানোর রাস্তা নিরাপদ করতে হবে। পাগলাঝোরার জলের সঙ্গে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনা করেছিলেন অশ্রুধারার।—হিমগিরি-কোণে, দেবদার বনে—

পাগলা-ঝোরার ধারার ন্যায়
অশ্রু দরিয়া-ঝরিয়া
মিলিত ভারতে ভাসায়ে যায়।

এখনও হয়ত আপনার মনে হবে এই ছোট ঝরণাটি পাহাড়েরই অশ্রুধারা। যে পাহাড় হয়ত কুটিল মানুষকে চায়নি কখনই।
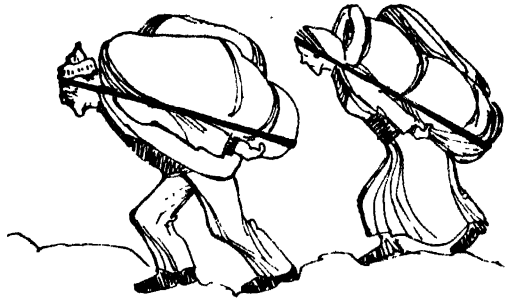
কার্সিয়ং-এ নেমে পড়তে পারেন

কার্সিয়ং-এর উচ্চতা ৪৮৬৪ ফুট। বলা হয়, দার্জিলিং-এর সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্সিয়ং ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। আরও বলা হয়, যদি দার্জিলিং-এ ইংরেজরা প্রথম বসতি না করে কার্সিয়ং-এ বসতি করত তাহলে শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং যেতেই হত না। কেননা, কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য যা দার্জিলিং থেকে দেখা যায় তা এই কার্সিয়ং থেকেও দেখা যায়। এছাড়া, এখান থেকে বালাসান নদীর 'পাখির চোখে দেখা' দৃশ্য অতি মনোরম। যাঁরা পর্যটক, তাঁরা দার্জিলিং পর্যন্ত এক ছুটে না গিয়ে এখানে অনায়াসেই নেমে পড়তে পারেন। এখানে হোটেলের অভাব নেই। প্রায় ষাট বছর আগেকার এক বর্ণনায় পাই সেখানকার খুব চমৎকার দুটি হোটেলের নাম। একটি হল ক্ল্যারেনডন, অপরটির নাম গ্র্যানড। পরে দ্বিতীয়টির নাম বদলে করা হয়েছিল উডহিল বোর্ডিং হাউস। এখানে নিকটবর্তী ডাউ-হিল এ রয়েছে মেয়েদের জন্য সরকারী স্কুল। এককালে এটা ছিল রেল কর্মীদের সন্তানদের জন্য তৈরী স্কুল। ছেলেদের জন্য ছিল ভিক্টোরিয়া স্কুল। এ ছাড়া এখানে হাসপাতাল এবং আরও বেশ কিছু 'ইউরোপীয়' ধাঁচের স্কুল রয়েছে।

কার্সিয়ং-এ সকালের খাওয়ার চমৎকার বন্দোবস্ত আগেও ছিল, এখনও রয়েছে। এখানে অবশ্য একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে—দেখা যায় একদল লোক গরম জামা কাপড় পরে নিচ্ছেন, গলায় জড়াচ্ছেন মাফলার, কেউ বা আবার

পরছেন ওভারকোট আর দস্তানা! আবার ঠিক একই সময়ে দেখা যায় একদল লোক ওভার কোট খুলছেন, দস্তানা খুলছেন, এমনকি সোয়েটার পর্যন্ত খুলে বাক্সে ভরছেন। একই রকম আবহাওয়ায় মানুষ জনদের এই দুরকম ব্যবহারের কারণ কি? কারণটা অবশ্যই সহজ। যাঁরা উপরে উঠতে যাচ্ছেন তাঁরা গরম জামা কাপড় পরছেন, আর যাঁরা সমতল ক্ষেত্রে নামতে যাচ্ছেন তাঁরা গরম পোশাক খুলে ফেলছেন।

এখানেই প্রথম চোখে পড়ে প্রচুর সংখ্যায় পাহাড়ী। বলা হয় এরা অতীব হাসিখুসি, স্বাস্থ্যবান এবং স্বাস্থ্যবতী—যাদের মুখ চাঁদের মত গোল ধরণের, চুলগুলো মোটেই কোঁকড়া নয়—সোজা সোজা। তাদের গাল লাল গোলাপের মত, আর চোখ গুলো ক্ষুদে ক্ষুদে। এদের মত কষ্ট সহিষ্ণু আর কাজের লোক সমতল ক্ষেত্রে প্রায় চোখেই পড়ে না। এরা যে কত পরিশ্রম করতে পারে আর ভার বইতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওরা চা-বাগানে কুলির কাজ করে। মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী। রাস্তার ধারে অনেক সময়েই দেখা যায় কণ্ট্রাক্টর এদের দিয়ে বড় বড় পাথর ভাঙাচ্ছে। কিন্তু কোনো সময়েই এদের মুখ গোমড়া করে থাকতে দেখা যায় না।

কার্সিয়ং শহর, পাহাড়ীদের মুখ, আকাশ, হিমালয়ের দৃশ্য, নানারকম গাছপালা, এ সবই মনকে এক মুহূর্তে খুসি করে দিতে পারে।

"সম্মুখে যা দেখি তারই ছবি নিতে ইচ্ছে হয়! হিমালয়ের বহু ছবি তুলব বলে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম, সে জন্য মনে কি রকম ক্ষোভ ছিল তা বলা বাহুল্য। মনে হল হিমালয়কে এবারে একবার দেখে নেব। এরকম পরিষ্কার আবহাওয়া তো আর মিলবে না।

"ধরমশালা থেকে বেরিয়েই দেখি এক পাহাড়ী, তার স্ত্রী, ছোট একটি মেয়ে ও একটি কুকুর নিয়ে চলেছে। স্বামী স্ত্রী দুজনের ঘাড়েই দুটো বোঝা। ওরা ওদের যা কিছু সম্পত্তি সব পিঠে বহন করে চলছে।

"এদেরই ছবি আগে নেওয়া ঠিক করলাম। ক্লান্তভাবে ওরা হেঁটে চলেছে, তবু বলা মাত্র থামল এবং যেমন ভাবে দাঁড়াতে বললাম তেমন দাঁড়িয়ে গেল আমাদের শখ মেটাবার জন্য। সবাইকে এক সঙ্গে

দাঁড় করিয়ে হাসতে বললাম, ওরা কিছুমাত্র আপত্তি না করে হাসতে লাগল।—সরল সুন্দর হাসি।

"বহুদূর থেকে ওরা আসছিল, বহুদূরে যাবে, এমনি অবস্থায় ওদের দাঁড় করিয়ে এতখানি কষ্ট দিলাম, বিনিময়ে ওদের খুশি করার জন্য ছোট মেয়েটির হাতে কিছু পয়সা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওরা কেউ পয়সা নিতে রাজি হল না। অথচ ওরা দরিদ্র এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ ছিল না। পয়সা নিল না উপরন্তু হাসতে হাসতে আমাদের নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।"

উপরের এই বর্ণনা দিয়েছেন পরিমল গোস্বামী, ১৯৩৯ সালের এই বিবরণ আজও কিছুটা সত্য। কিন্তু সমতলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনেক বেড়েছে ইতিমধ্যে। আমাদের কাছ থেকে নতুন নতুন অনেক কিছুই তারা শিখে নিয়েছে। ১৯১৯ সালে ঘুম স্টেশনে যখন পরিমল গোস্বামী ছিলেন তখন তিনি একটা ঘটনা শুনতে পান। সেটি আজকের দিনে মোটামুটি সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় "অঘটন আজও ঘটে" এই শিরোনামায় প্রকাশের উপযুক্ত। তিনি লিখেছেন:

"আমি যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক বাজার করতে যান দার্জিলিং-এ। সেখানে এক কুলীর পিঠে নানারকম জিনিসপত্র চাপিয়ে চলতে চলতে ভীড়ের মধ্যে কি করে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যান। ভদ্রলোক কুলীর চেহারা মনে রাখেননি, তাড়াতাড়ি খুঁজেও পাননি। অবশেষে পালিয়েছে সন্দেহ ক'রে অল্প কিছু জিনিস নিজ হাতে কিনে আনেন। তিনি ফেরেন বেলা এগারোটায়। এদিকে কুলীটি তাঁকে খুঁজে না পেয়ে জনে জনে জিজ্ঞাসা করে বিকেল বেলা মোট এনে পৌঁছে দেয় তাঁর বাড়ীতে। আন্দাজ করে এসেছিল, ভেবেছিল ভুল বাড়ীতে আসছে। এজন্য সে কেঁদেই অস্থির।"

ছবির জায়গা ছিল ঐ ১৯৩৯-এর কার্সিয়ং। পরিমল গোস্বামী পথের ধারে এত ছবি এক দিনে একই জায়গায় বসে আর কখনও তোলেননি। তোলার

সুযোগ ঘটেনি, কেননা, "যে যায় তাকেই দাঁড় করিয়ে ছবি নিচ্ছি নানাভাবের পোজ্ দিয়ে। কেউ আপত্তি করল না, সবাই খুশি হয়ে পোজ দিয়ে গেল। যাবার সময় একখানা ছবি চেয়েও গেল না। চলতি নরনারী, দু চার মিনিট আমাদের খেয়াল মিটিয়ে নিজেরাই খুশি!" এখন সব দৃশ্যের অধিকাংশই পাওয়া যাবে, তবে সেই সব মানুষ কি আর আছে।

পাহাড়ীদের গুরুভার বইবার ক্ষমতা প্রচণ্ড। এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ দেওয়ার দরকার আছে কি? ভার বাইবার এবং কষ্ট সইবার ক্ষমতা আছে বলেই না হিমালয়ের অধিকাংশ অভিযানে তারাই অগ্রাধিকার পেয়েছে। গল্প আছে, একজন পাহাড়ী বিরাট এক বোঝা নিয়ে পাহাড়ের পথে চলেছে, বোঝাটা এতবড় যে তাতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে, তখন সে বোঝাটা রাস্তার পাশে নামাল। এরকম কাজে খুব আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার নেই, এটা আমরা তো হামেসাই করে থাকি। ক্লান্তি এলে বিশ্রাম নেওয়াই তো প্রথা। কিন্তু পাহাড়ী তা না করে দশ বারোটা এক কেজি দেড় কেজি ওজনের পাথর তার ঝোলার মধ্যে ভরে নিল। নিয়ে পথ চলতে লাগল। এবারে বোঝা আরও ভারি হল, তার এরকম আচারণের অর্থ বোঝাও দায় হয়ে উঠল! কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন—লোকটি এবারে কি করছে দেখা যাক।

দেখা গেল লোকটি কিছুদূর যাচ্ছে আর একটা করে পাথর ঝোলা থেকে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে। যত পথ যায় তত তার হালকা বোধ হতে থাকে!

একজন পাহাড়ী কতখানি বোঝা নিয়ে অনেকটা পথ চলতে পারে?

ডোরজির অভিজ্ঞতা হল এই ১৯১২ সালে তিনি দেখেছেন এক ভুটিয়া চার মোন আট সের, অর্থাৎ প্রায় একশো ষাট কেজির এক কাপড়ের বস্তা দার্জিলিং রেলওয়ে মাল ঘর থেকে কমারশিয়াল রো পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এর উপর সে দিনটাও ছিল ভিজে।

কার্সিয়ং জায়গাটা খুব হেলাফেলার নয়। অনেকেই দার্জিলিং-এর চাইতে কার্সিয়ংকেই বেশি পছন্দ করেন তার দুটি কারণ। এক নম্বর হচ্ছে জায়গাটা দার্জিলিং থেকে কুড়ি মাইল কম, আর দ্বিতীয় কারন হল কার্সিয়ং দার্জিলিং-এর মত অত উঁচু নয় বলে ঠাণ্ডাটাও একটু কম। ১৯৩০ সালে নলিনী মজুমদার দার্জিলিং সংক্রান্ত একটা বইতে লিখছেন, "দার্জিলিং বা কার্সিয়ং-এ যাঁহাদের

একখানি বাটি আছে তাঁহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে কুলীন পুত্রের পিতা ও কন্যাদায় গ্রস্ত ব্রাহ্মনের কথা মনে পড়ে।" চমৎকার সংক্ষিপ্ত বিবরন।

এই কার্সিয়ং-এই একদা সুভাষচন্দ্র বাড়ি কেনার কথা বলেছিলেন। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (যত দূর মনে পড়ে) কলকাতায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে দু কাঠা জমির উপর বাড়ি করার চেয়ে এই রকম খোলামেলা জায়গায় বাড়ি করা অনেক ভাল।

এই কার্সিয়ং যে অতি চমৎকার জায়গা সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কেননা আমরা কড়া সমালোচক খুঁতখুঁতে মেজাজের প্রমথ চৌধুরীর সার্টিফিকেট পাচ্ছি:

ঝুলে আছ গিরি পল্লী আকাশের গায়,
অটল পর্বত পৃষ্ঠে করিয়া নির্ভর,
ধরে' আছে শিরে বোঝা হিমের কর্পর,
শুয়ে পড়া বঙ্গভূমি চরণে লুটায়।

ক্ষণে তব হাসি মুখ, ক্ষণে মেঘে ছায়
ঝরে বুকে সুখে দুঃখে অশ্রুর নির্ঝর
কানে তব অহর্নিশি বনের মর্মর
গাহিছে ঘুমের গান অস্ফুট ভাষায়।

তোমার কোলেতে বসি আমি ভালবাসি
হেরিতে বিচিত্রগতি মেঘ রাশি রাশি;
কখনো হাঁসের মত ভাসে নীলাকাশে,
পলকে আবার ধরে আকার ধুঁয়ার।

ভোরে সাঁজে মাঝে মাঝে মেঘ অবকাশে
চোখে পড়ে অলঙ্কার সোনার দুয়ার।

এই কার্সিয়ং-এ বসেই প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন তেপাটি। তিনি কার্সিয়ং এর ঊষা, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা এবং মধ্যরাত্রিকে ছন্দোবদ্ধ করে রেখেছেন। এখানে প্রমথ চৌধুরীর মত লোক একেবারে অন্য জগতের মানুষ। তিনি আর কঠিন

নন, তিন দ্রব। আর সমালোচক নন, একেবারে ভাব জগতের পথিক! তিনি লিখেছেন :

দেখ সখি আলো চলে যায়।
বিশ্ব এবে আঁধার মিশায়,
তাই বলে হয়োনা চঞ্চল।

এবার এখান থেকে আরও একটু উপরে ওঠা যাক।

দিনের শেষে ঘুমের দেশে

এবার দেখা যাবে চেস্টনাট, পাহাড়ী গেছো ফার্ন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের আরও বদল ঘটেছে। চোখে নতুনের পর নতুন দৃশ্য দেখেই চলেছে ট্রেন এখন চলেছে ঘুমের দিকে কাসিয়ং স্টেশন ছাড়লেই চোখে পড়ে ডানদিকে উঁচু পাহাড়ের উপর বাড়ির সারি। একটি হল সেণ্ট মেরি'স ট্রেনিং কলেজ। চোখে পড়ে বালাসান নদীর পাখীর চোখে দেখা উপত্যকা অবশ্য। দিনটা পরিষ্কার থাকা চাই আর এদিকে তো কখন মেঘ আসছে কখন যাচ্ছে, কখন রোদ্দুর' কখন ছায়া তার ঠিক ঠিকানা নেই। সাধে কি একজন ইংরেজ বলেছিলেন, একেবারে যেন লণ্ডনের আবাহাওয়ার কপি!

কিছুদূর গিয়েই টুং। মনে পড়িয়ে দেয় অবনীন্দ্রনাথের 'ভুত চৌদশী' যেখানে—সাড়ে তিনটাতে মশারির ছাতে ছিনিমিনি খেলে চামচিকাতে উইচিংড়াতে। বুড়ো টিকটিকি বাদলা পোকাকে করে ফেলে খুন, মাকড়সা আরশোলাকে ধরে নিয়ে যায় টুং—সোনাদা—ঘুম—বয়ে বসে চিবাতে।

টুং এরপর সোনাদা। ক্ষুদে ট্রেন চলেছে। সোনাদা-র মানে কি? সোনাদা মানে ভালুক, স্থানীয় ভাষায়। তবে এখানে ভালুক আর দেখা যায়না।

ঘুমের দেশে ট্রেন চলেছে দার্জিলিং—হিমালয় রেলপথের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। উঠতে একটু কষ্ট হচ্ছে ট্রেনের। তা হোক- আমাদের উৎসাহে কিন্তু ভাঁটা পড়ছেনা, উৎসাহ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

টুং ৫৬৫৬ ফুট, সোনাদা ৬৫৮৮ ফুট এবং ঘুম ৭৪০৭ ফুট উঁচুতে।

মংপুর সিনকোনা চাষ দেখতে চাইলে সোনাদায় নেমে পড়তে হবে। মংপু ৫২০০ ফুট উঁচুতে। সোনাদার নাম এককালে স্থানীয় লোকদের কথায় হয়ে পড়েছিল পচীম। মনে হয় যে তার কারণ 'পশ্চিম' দেশের লোকেরা এই স্টেশন থেকে নিচের দিকে, মাইল দুয়েক দূরে 'হোপ টাউন' বানিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সায়েবদের জন্য একেবারে পৃথক একটা কলোনি। একেবারে এক্সক্লুসিভ ব্যাপার। কালা আদমী, হলদে আদমিরা সেখানে থাকতে পারবেনা। দারুণ উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল একদা সায়েবদের মনে। আরো একটা মত ছিল তাদের। এখন দার্জিলিং রেল যে পথ দিয়ে গেছে প্রথমে এই পথ দিয়ে যাওয়ার কথা ছিলনা। কথা ছিল রেল আসবে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত (শিলিগুড়ি পর্যন্ত নয়), তারপর সেখান থেকে ছোট ট্রেন তরাই ভেদ করে হোপ টাউনের নিচে দিয়ে দার্জিলিং যাবে। সে কথাই ভেবেছিলেন ই বি রেলপথের ম্যানেজার মেজর লিনডসে।

১৮৫৬ সালে হোপ টাউন স্কিম তৈরি হয়ে যায়। তখনকার দিনের বড়বড় সায়েব সুবোরা এই হোপ টাউন—(আসলে তখন এটা ছিল গ্রাম) নিয়ে দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এই স্কিম চালু করলেন ফ্রেড ব্রাইন। দার্জিলিং এর গভর্নরের বাড়ির জমাটা ছিল এঁর—সরকার এঁর কাছ থেকেই জমিটা কিনে নেন। ইনি অফিসারও। কলকাতার ফিনানসিয়াল সেকরেটারি অফিসের ই-ডি ক্রুজ, শ্রীমতী হেনরিয়াটা কোলব্রুক টেলর, রাণীগঞ্জের ডক্টর রবার্টস ইত্যাদিরাও ছিলেন সঙ্গে। এঁরা হোপ টাউনের জমি জলের দামে কিনে বেশি দামে বেচে লাল হবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬৮ সালের মধ্যে কয়েকটা বিলিতি ধরণের ছোট ছোট কটেজ তৈরি হয়ে গেল, তৈরি হয়ে গেল এটা গীর্জেও। গীর্জের নাম হল সেণ্ট জন'স চার্চ। এখানেই এক ভদ্রলোক চালু করলেন এক চা'য়ের বাগান—ওকস টি

এসটেট। তখন নীল চাষএর ভবিষ্যত অনিশ্চিত, কিন্তু চা অনেক টাকা দিচ্ছে। অতএব পয়সা যাঁদের ছিল তাঁরা নীল থেকে চা এর চাষ করে লাল হবেন বলে মনে করলেন।

সোনাদার পর থেকে প্রচুর ওক গাছ দেখা যাবে।

এর পর ঘুম। সব সময়েই দেখা যায় দার্জিলিং থেকে ঘুমের তাপ অন্তত পাঁচ ডিগ্রী কম। এর কারণ, জায়গাটা উঁচু। এ ছাড়া অন্য কারণ হল এখানে পাহাড়ের প্রাচীরে রয়েছে বিরাট এক ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে বিনা বাধায় ঢুকে পড়ে ঠাণ্ডা বাতাস। অতএব যাঁরা সত্যি সত্যি ঠাণ্ডা ভালবাসেন তাঁদের পক্ষে জায়গাটা খুব মন্দ হবেনা! তবে ভাল লাগুক আর মন্দ লাগুক কয়েকটি জায়গায় যেতে হলে এখানে নেমে পড়তেই হবে। যেমন পেশক রোড। এটা চলে গিয়েছে তিস্তা ব্রিজ পর্যন্ত। তারপর সেখান থেকে কালিম্পং। কালিম্পং-এ এককালে তৈরি হয়েছিল অনেকগুলি "কলোনিয়াল হোমস"। সেগুলি ছিল এমন চমৎকার এবং ব্যবস্থা এত ভাল ছিল যে চীনা রাষ্ট্রদূত নাকি সহর্ষে বলেছিলেন, "আমার বস্তুতান্ত্রিক জগতের প্রতি শ্রদ্ধা হারানোর মূলে যদি কিছু থাকে তো এই হোমগুলি।" তিনি কবে বলেছিলেন, আর তাঁর কি নাম ছিল তা আমি খুঁজে বার করার চেষ্টা করিনি। যদি কারুর উৎসাহ হয় তো লাইব্রেরিতে বসে বার করে নেবেন, আমি কেবল বলেই খালাস! এই সব হোম-এর মূলে ছিলেন রেভারেণ্ড ডঃ জে এ গ্রেহাম।

ঘুম থেকে পেশক রোড ধরে ঠিক ছ মাইলের মাথায়—জায়গাটার নামই দি সিক্সথ মাইল, একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে তাকদা-র দিকে। এখানে আজকাল অর্কিড চাষ হয়—আর দেখার জিনিসও বটে এটা।

আর ঘুম থেকেই যেতে হয় টাইগার হিল। উচ্চতা ৮৫১৫ ফুট। এখান থেকে পরিষ্কার দিনে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া, মাউণ্ট এভারেস্ট-এর দর্শন মেলে। তবে এ দর্শন কবে এবং কখন মিলবে তা বলা ভারি শক্ত ব্যাপার।

ঘুম-এর পশ্চিম দিকে সাড়ে তিন মাইল গেলে পাওয়া যাবে ঘুম পাথর। ৯৫ ফুট উঁচু এই পাথরের বিরাট ব্যাপারটি এককালে বিখ্যাত ছিল খুবই। এর উপরে প্রায়ই পিকনিক্ করা হত একদা। এবং তারও আগে এর উপর পিকনিক্ ঠিক নয় একটু অন্যরকম ব্যাপারও ঘটত বলে শোনা গেছে। যখন এই রাজত্বটা ছিল

নেপালের দখলে, তখন গুরুতর অপরাধীদের এই পাথরের উপর নিয়ে গিয়ে—না, পিকনিক নয়, ঠেলে ফেলা দেওয়া হত।

ঘুম-থেকে দার্জিলিং এর দিকে একটু গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে প্রথম বুদ্ধ-মন্দির। আর উপরের দিকে জলাপাহার আর কাটা পাহাড়ের সৈন্যাবাস।

ঘুম থেকে দার্জিলিং ৪ মাইল। পথে পড়ে ক্ষুদে রেলের এক আশ্চর্য লুপ। এর নাম বাতাসিয়া।
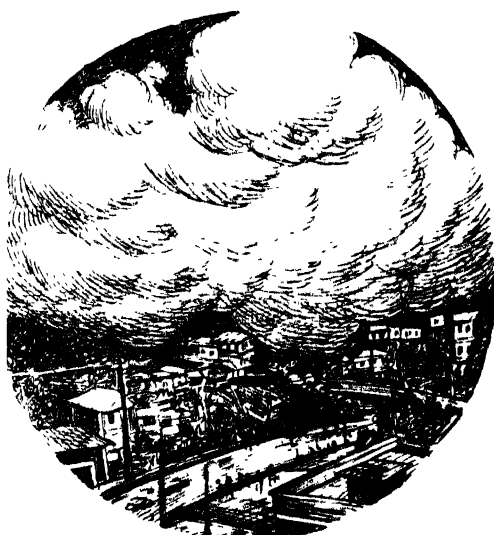
দার্জিলিং! দার্জিলিং!!

১৮৯১ সালে তৈরি স্টেশন—পরে আবার নতুন করে করা হয়েছে, নামলেই মনে হবে, এলেম নতুন দেশে। যদিও সমস্ত পথটায় তার জন্য প্রস্তুতির অভাব ছিল না। আস্তে আস্তে উপরে উঠতে উঠতে বদল ঘটে গেছে—কিন্তু তবু, দার্জিলিং! এবং ঐ স্টেশন থেকেই একটা যেন রোমান্সের শুরু। আকাশ, বাতাস, দৃশ্য—সবই এখন রয়ে সয়ে দেখা যাবে। প্রথম দিনের বিকেলটা, ক্লান্ত থাকলে

কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পারেন, আর হোটেল যদি আগে থেকে ঠিক করা না থাকে, তাহলে গ্রীষ্মকালে তো হোটেল খুঁজতে খুঁজতেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। যদিও দার্জিলিং-এ হোটেলের অন্ত নেই। দার্জিলিং-এর প্রথম যে বাড়িগুলি তৈরি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে একটি ছিল হোটেল—যদিও আমরা দেখেছি, প্রথম দিকে তাতে লোকই হতনা। পরে ধীরে ধীরে, বিশেষ করে রেলপথ খোলার পর দার্জিলিংএ হোটেল ব্যবসা বাড়তে থাকে। প্রথম হোটেলের নাম দার্জিলিং ফ্যামিলি হোটেল। তারপর হল উইলসন'স হোটেল। কলকাতায়ও এই হোটেলের মালিকের একটি হোটেল ছিল, এবং তারও নাম ছিল উইলসন'স হোটেল। পরে এর নাম বদলে করা হয় গ্রেট ইসটার্ন হোটেল। তারপর ক্রমাগত একের পর এক হোটেল খুলতে থাকে—বেলেভিউ-এর মালিক ছিলেন মিসেস কেলি, গ্যারেটস (সেণ্ট্রাল হাউস), মেহনির তত্ত্বাবধানে খোলা হল ড্রাম ড্রুইভ, মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেল, পার্ক হোটেল, রকভিল, উডল্যানডস, এডা ভিলা, অ্যালিস ভিলা, বীচউড হাউস, কেরোলিন ভিলা, এল এসপারানজা, ফার্ন কটেজ, হ্যাভলক হাউস, লা রোশ, মে কটেজ, মস ব্যাংক, দি লেবিরিনথ ইত্যাদি। বাঙালী হোটেলও কিছু কিছু খুলতে লাগল—হিন্দু ন্যাশনাল বোর্ডিং, মিত্র বোর্ডিং, দার্জিলিং হিন্দু বোর্ডিং, অন্নপূর্ণা বোর্ডিং।

পুরনো আমলে যে হোটেলের দাম কম ছিল তা না বলে দিলেও চলবে। সে সব আমলে টাকার দামই ছিল অনেক। উনিশ শো ত্রিশের গোড়ার দিকে কলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক রাত্রিবাসের জন্য খরচ ছিল দশ টাকা। "মাত্র আট আনা ট্যাকসি ভাড়া দিলেই ব্যবসা কেন্দ্রে যাওয়া যায়।" ১৯৪৯ সালেও দাজিলিংএর হোটেলের খরচ ছিল কম। ঐ বছরে লুইস জুবিলি স্যানাটারিয়াম-এ আমরা ছিলাম দৈনিক তিন টাকা খরচে। হাল্কা ব্রেকফাস্ট, দুপুরের মাছ ভাত, বিকলের চা এবং দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুট আর রাত্রে মাংস ভাত—এ সবই ঐ তিন টাকার মধ্যে।

উনিশ শো ত্রিশের গোড়ার দিকের একটা হিসাব নেওয়া যাক। নলিনী মজুমদার দার্জিলিংএর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন, "দার্জিলিংএ মাংসের দাম খুব সস্তা, এবং মৎস্যও দুষ্প্রাপ্য নহে। বড় বড় রোহিত, কাতল, চিতল প্রভৃতি, এমন কি জীবিত কৈ, মাগুর মৎস্য পর্যন্তও সকল সময়ে পাওয়া যায়। বসন্ত, গ্রীষ্ম

শরৎ ও হেমন্ত ঋতুতে মৎস্যের সের দেড় টাকা পর্যন্ত হয়। অপরাপর সময়ে ইহা আট হইতে দশ আনার মধ্যে থাকে।

"অপরাপর সময়ে" অর্থাৎ বাকি রইল শীত। শীতের সময় দাম কমে যায়। ১৯৭৭-এর জানুয়ারিতে ববফজমা শীতে আমার একবার এই শহরে যাবার সুযোগ হয়েছিল—তখন বাজারে রুই মাছ তেরো টাকা কিলো ছিল। মজার ব্যাপার এই, ঠিক সেই সময় শিলিগুড়িতে ঐ একই মাছের দাম ছিল ষোলো থেকে আঠারো টাকা। মাছওলাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মাছ কোত্থেকে আসছে? মাছওলা উত্তর দিল, শিলিগুড়ি থেকে। অর্থাৎ, শিলিগুড়িতে মাছওলারা যে ন্যায্যের অতিরিক্ত লাভ লুঠছে সে বিষয়ে একেবারেই সন্দেহ রইল না।

যাই হোক, 'সীজন'এ দার্জিলিংএ প্রায় সব জিনিসেরই দাম বেড়ে যায়, আর শীতকালে জিনিসপত্রের দাম কমতে থাকে। এইকারণে কেউ কেউ শীতের দার্জিলিং দেখতে আগ্রহ বোধ করেন। তবে একটু শীত-সহিষ্ণু না হলে শীতকালে এ সহর তাঁদের মোটেই ভাল লাগবে না। এই কারণেই শীতকালে অনেক হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। হোটেলের অনেক অস্থায়ী কর্মীকেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক দোকানও বন্ধ থাকে। কিন্তু মনে হল অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটছে। শীতঋতু আগে যেমন দার্জিলিংকে প্রায় ফাঁকা করে দিত এখন আর তেমন ফাঁকা হয়ে যায় না। অনেকে শীত সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু সাহস করে শীতের মুখোমুখি হতে চান। এঁরা হলেন এক ধরণের অ্যাডভেঞ্চারার। অনেকে গ্রীষ্মকালে ছুটি পান না। কেউ কেউ গ্রীষ্মকালে দশদিনের জন্য দার্জিলিং-এর ঠাণ্ডায় আরাম করে তারপর সমতল ভূমিতে নেমে আগের চেয়েও বেশি কষ্ট করতে চান না। তার চাইতে বোঝা বইবার সময় পাহাড়ীদের অতিরিক্ত কষ্ট হলে যেমন তারা আরও কিছু পাথর চাপিয়ে নিয়ে তারপর সেগুলো ফেলে দিয়ে স্বস্তি বোধ করে তেমনি অনেকে আছেন যাঁরা শীতের সময় দার্জিলিং গিয়ে এবং ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে নিচে নেমে স্বস্তি বোধ করেন। এই সব মানুষ নমস্য। তবে যারা বয়সে তরুণ, এবং রক্তটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি তাদের আমি বলব দার্জিলিং যদি যেতে হয় তাহলে শীতে যাওয়াই ভাল। তার কারণ, ঐ সময় দার্জিলিং এবং তার আশে পাশে প্রচুর হাঁটা যায়, এবং তাতে ক্লান্তি অনেক কম বোধ হয়। জানুয়ারি মাসের দার্জিলিং আমি দেখেছি—আমার শীত

করেছে ঠিকই, তবে সেই সঙ্গে ভালও লেগেছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে একটা ব্যাপারে তা হল রাস্তায় অগুণতি ফ্যাশনধারী ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়নি, এবং কোন্ হোটেলে উঠেছেন—এবং তার চার্জ শুনে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেননি, ওমা, ওরা মাত্র সতেরো টাকার হোটেলে উঠেছে, কী ঘেন্না! তবে, এই সব ব্যক্তিরাও আমাদের দেশেরই আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছেন; বেড়ে উঠেছেন, তাঁদের ধারণা পয়সা অতিরিক্ত পরিমাণে খরচ না করলে, কিংবা সেটা না দেখাতে পারলে সমাজে মান থাকে না। তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সমাজে কলকে পান—এবং তাঁরা মনে করেন না যে অর্থ সভ্যতা অনেকটা অর্ধ-সভ্যতারই নামান্তর।)

এবারে সরকারী পর্যটন বিভাগের তালিকা থেকে কিছু হোটেলের নাম এবং দৈনিক চার্জ উল্লেখ করলাম। বলা বাহুল্য, এই সব চার্জ আজও একই আছে কিনা আমার জানবার কথা নয়। সম্ভবত কিছু অদল-বদল ঘটে গেছে। যাঁরা কোম্পানির টাকায় ছুটি উপভোগ করেন তাদের অবশ্য আগে থেকে হোটেলের রেট জানার এবং পাই পয়সার হিসেব করার দরকার করে না, কিন্তু অন্য যাঁরা—যাঁরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার জন্য সারা বছর ধরে—বা কখনও কখনও বছরের পর বছর ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করেন, তাঁদের উচিত আগে থেকে বিপদ ভেবে জেনে নেওয়া যে দার্জিলিং-এ পৌঁছে হোটেলে দৈনিক কত খরচ হতে পারে। সুবিধে হলে আগে থেকেই হোটেলে পাকা রিজার্ভেশন করা ভাল, কেননা দার্জিলিংএ পৌঁছে হোটেল খোঁজাখুঁজি করতে করতে আর দালালদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে সময় কাটানোটা কোনো কাজের কথা নয়।

হোটেল, চার্জ এবং ব্র্যাকেটে কতগুলি বেড আছে তা জানানো হল।

টুরিষ্ট লজ টেলি: ২৬১১—১৩ গ্রাম: DARTOUR	ভানু সরণি—ম্যাল রোড (৬১) খাদ্য ছাড়া দৈনিক ৪০—৭০ টাকা, ৫০—৯০। খাদ্য দৈনিক ৩২ টাকা, ৫—১২ বছরের বালক বালিকাদের জন্য ২০ টাকা। কেবল ঘর ভাড়া নেওয়া চলবেনা। খাদ্যের জন্যও চার্জ দিতে হবে।

মেপল টেলি : ২০৯২ গ্রাম : DARTOUR	ওল্ড কাছারি রোড (২৩) সিঙ্গল বেডরুম ১৫ টাকা ডবল বেডরুম ২৫ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা সহ ডবল বেডরুম ৩২ টাকা থেকে ৪০ টাকা, ৩ বেডওলা ঘর ৪০—৪৫ টাকা রান্নার ব্যবস্থা সহ।
শৈলাবাস টেলি : ২৬৮৪ গ্রাম : DARTOGR	ডঃ জাকির হোসেন রোড (৬১) ৪ বেডওলা স্যুইট ২৮ থেকে ৩২ টাকা।
টাইগার হিল টুরিস্ট লজ, টেলি : ২৮১৩	সিঞ্চল, ঘুম (২৪): স্ট্যানডার্ড ডিনার সহ ৩৩·৫০ টাকা, ইকনমি ডিনারসহ ২৯·৫০ টাকা। এছাড়া আছে ডবল বেডেড, ডরমিটরি ইত্যাদি। ডরমিটরিতে খাদ্যসহ চার্জ (সবচেয়ে কম যেটা) হল ১০ টাকা ৫০ পয়সা।
লইস জুবিলি স্যানাটারিয়াম টেলি : ২১২৭	স্টেশনের খুব কাছে এস কে পাল রোড (২০৩) : প্রথম শ্রেণী—২৪ থেকে ৪৪ টাকা, ২য় শ্রেণী—২০ „ ৩২ টাকা ৩য় শ্রেণী—১৫ টাকা
পঃ বঙ্গ সরকারের ইউথ হসটেল টেলি : ২২৯০	ডঃ জাকির হোসেন রোড (৪৬) মাথা পিছু ৫ টাকা। অ্যাডভানস বুকিং।
ওবেরয় মাউন্ট এভারেস্ট টেলি : ২৬১৬, ২২৩৬, ২৬১৮ গ্রাম : SNOW	গান্ধী রোড (১২০) দৈনিক সিংগল ১৪৫ টাকা, ডবল ২১৫ টাকা। স্যুইট ৩৫৫ টাকা।
উইণ্ডামেয়ার হোটেল টেলি : ২৮৪১ ২৩৯৬ গ্রাম : WINDA-MERE	ভানু সরণি। ম্যাল রোড (৫০)—সিংগল ৬৬ টাকা ডবল ১১৪ টাকা।

অ্যালিস ভিলা হোটেল
টেলি : ২৩৮১
গ্রাম : ALICEVILLA

এইচ ডি লামা রোড (৩১) বেড+ব্রেকফাস্ট ২ জনের জন্য ৫৫ টাকা। ৩ জনের জন্য ৭৫ টাকা। ৪ জনের জন্য ৮৮ টাকা

সেণ্ট্রাল হোটেল
টেলি : ২০৩৩ ২১৬০
গ্রাম : NADAM

রবার্টসন রোড (৪৪) একজন ৫২ টাকা। দুজন ১০০—১১০ টাকা

নিউ এলগিন হোটেল
টেলি : ২১৮২ ২৫৮৮
গ্রাম : NEWELGIN

এইচ ডি লামা রোড (২৪) ৪৫—৫৫ সিংগল, ডবল ৯০ টাকা থেকে ১১০ টাকা। কেবল বেড+ব্রেকফার্স্ট ২৫—৩০ টাকা

টিফানি হোটেল
টেলি : ২৭৩০
গ্রাম : TIFFANY

ফ্র্যাংলিন প্রেসটিজ রোড (২৪) স্যুইট ১৩০ টাকা /

প্রধান’স হোটেল
পলিনিয়া
টেলি : ২৮২৬

এইচ ডি লামা রোড (৪৮) সিংগল ৫৫—৭৫ টাকা। ডবল ৮৫—১৩০ টাকা। স্যুইট ১৬৫ টাকা।

পাইন রীজ হোটেল

১৭ নেহরু রোড (২২)
টেলি : ২০৯৪
গ্রাম : PINERIDGE

হোটেল কোজিহোম
টেলি : ২০৯৪

১৬, নেহরু রোড (১০) দুজনের জন্য ৫০—৬০ (বেড + ব্রেকফাস্ট)।

ভারতীয় কায়দার হোটেল

অ্যামবাসাডর হোটেল
টেলি : ২৭৮১

১ বি চৌরাস্তা (২৪) সিংগল ৩৪·৫০—৪৬ টাকা।

অশোক হোটেল
টেলি : ১৭৫১

২ সি রকভিল, কুচবিহার রোড (৫১), ৩১ টাকা থেকে ৩৪·৫০ টাকা

অনামিকা হোটেল — ১ বি গান্ধী রোড (২৭), ১৮ থেকে ২২ টাকা
ব্রডওয়ে হোটেল — ২/১ কুচবিহার রোড (৩৫), ২০ থেকে ৪০ টাকা
বীচউড রেস্ট হাউস — (২২) ১০ থেকে ২৫ টাকা
সেন্ট্রাল বোর্ডিং — ৩, এন সি গোয়েঙ্কা রোড (৬৬), ১৪ থেকে ২০ টাকা
দার্জিলিং হোটেল — ৪এ বিলামরে রোড (২৫) ১০ থেকে ১৫ টাকা
এভারগ্রীন হোটেল — ১ বর্ধমান রোড (২১) ১২ থেকে ১৭ টাকা
টেলি : ২৭০৭

ফ্লোরা হোটেল — ডঃ এস এস দাস রোড (২৩) ১২ থেকে ১৮ টাকা
গ্র্যানড-ভিউ হোটেল — রক উড (৩১) ১২ থেকে ২৫ টাকা
হিমাল চুলি হোটেল — ১, ডঃ এস এস দাস রোড (১৮) ১৩ থেকে ১৮ টাকা
হিলভিউ হোটেল — আন্নাকট (১৬) ১৪'৪০ টাকা থেকে ১৯ টাকা
হিন্দু বোর্ডিং — চাচন ম্যানশন (১৯) ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা
টেলি : ২২৬০
গ্রাম : MUSTAFI

কৈলাস হোটেল — কার্টরোড (২০) ১৫ টাকা থেকে ২৫ টাকা
টেলি : ২৮২৯
কুণ্ডু হোটেল — ২এ রকভিল রোড (৩৫) ২৮ টাকা থেকে ৫৫ টাকা
টেলি : ২১৪৬—২৮৬৭

কাঞ্চনজঙ্ঘা হোটেল — কার্ট রোড (৪১) ২৫—২৭ টাকা
মিলন হোটেল — হিল কার্ট রোড (৩৪) ১০—১৫ টাকা
ম্যাজেস্টিক হোটেল — ২, এম চাঁদ রোড (২৪) ১৫—২০ টাকা
টেলি : ২৮৩৪

নিউ মাউন্টভিউ হোটেল — এম এন ব্যানারজি লেন (২৬) ১২—৩৫ টাকা
টেলি : ২৪১৮

নিউ শিস্‌মহল — গান্ধী রোড (২১) ১২—২৫ টাকা
নটরাজ হোটেল — রক উড (২৯) ১২—১৬ টাকা
টেলি : ২৯০৮

নিকুলা'স হোটেল ১৬ গান্ধী রোড (৪৯) ১৬—২৫ টাকা
এমব্যাসি
টেলি : ২৭৫৭

নিউ এভারেষ্ট গান্ধী রোড (৫৮), ১৬—২৫ টাকা
লাকসারি হোটেল
টেলি : ২২৫২

হোটেল মোনা-লিসা ১এ তুং সুং রোড (২৪) ২০ টাকা

প্যানোরমা হোটেল আপার বীচউড রোড (১৯) ১৮—২৫ টাকা
টেলি : ২১৪৩

শবনাম ৩৫ লেভেনলা রোড (২৮) ২২—২৫ টাকা
টেলি : ২৩১৫

স্নো-ভিউ হোটেল হিল কার্ট রোড (৮৯) ১৫—৩০ টাকা
টেলি : ২০৪০

সামার বুন হোটেল ক্লার্ক রোড (৪৬) ২০—৩০ টাকা
টেলি : ২৫১৫

সোসাইটি হোটেল রবার্টসন রোড (২০) ২০—৩০ টাকা
টেলি : ২৩১৬

স্প্রিং বার্ন গান্ধী রোড (৩০) ২০—৩০ টাকা
টেলি : ২০৫৪

টাইগারহিল হোটেল জানবাজার (২৯) ১০—২২ টাকা

ওয়েসাইড ইন হিল কার্ট রোড (১৮) ১১—১২'৫০ টাকা

অন্যান্য বাসস্থান

অভেরি মিসেস ই ডি কেনিলওয়ার্থ—বেড ও ব্রেকফাষ্ট ১৫ টাকা

আভা আর্ট গ্যালারি (১০) ১৫ টাকা বেড ও ব্রেকফাস্ট
টেলি : ২৪৬৯

দিলখুসা	ডঃ এস এম দাস রোড, ৬—৯ টাকা
জ্যোতিসদন	১৮ বি এম চ্যাটারজি রোড (২৬) নিরামিষ হোটেল,
টেলি : ২৩৭৫	সিংগল ১৫ টাকা, ৩ বেডওলা ৩০—৩৫ টাকা
হিলটপ হোটেল	(১৫) ৫—৮ টাকা
লজ মোনাস লু	৪ লেডেনলা রোড (২৬) ৭—৯ টাকা
নিউ ইনডিয়ান হোটেল	নিউ ইনডিয়ান হোটেল (৫৯) ১০ টাকা
টেলি : ২২৭২	
শ্রী লজ	বালেন ভিল রোড (২৯) ২৫ টাকা দুজন, ৩৫ টাকা তিনজন
টেলি : ২৮৯৩	
শাংগ্রিলা	নেহরু রোড (২২) ২০—২৫ টাকা
টেলি : ২০০৮	
স্টুয়ার্ট লজ	৫ ডঃ এস এম দাস রোড, ৭ টাকা
আনজুমান ইসলামিয়া গেষ্ট হাউস	মসজিদ রোড—১০—১৫ টাকা প্রতি ঘর।

যাঁরা দার্জিলিংএ ঘর, বাড়ি বা কটেজ ভাড়া করে নিজেরা রান্না-বান্না করে দীর্ঘ দিনের জন্য থাকতে চান তাঁরা এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন :—

(১) শ্রীডি বি সিং
এন বি সিং রোড
মে কটেজ—দার্জিলিং

(২) শ্রীএস এম রায়
৫১, বীচউড
লেডেনলা রোড—দার্জিলিং

আর একটা কথা এখানে বলা দরকার। হোটেল সংক্রান্ত যে সব তথ্য ওপরে দেওয়া হল সেটি আমি ১৯৭৬এর শেষের দিকে সংগ্রহ করেছিলাম পর্যটন বিভাগ থেকে। ঐ সময়ে লেখা হয়েছিল পর্যটন বিভাগ যে তথ্য হোটেল সংস্থাগুলি থেকে পেয়েছিলেন তাই তাঁরা প্রকাশ করেছেন। আমার মনে হয় হোটেল চারজ সম্পর্কে সর্বদা তথ্য সম্পূর্ণ নয়। কোথায়ও লেখা রয়েছে কেবল দশ টাকা—কিন্তু সেই দশ টাকায় কেবল বিছানা দেওয়া হয়, না সঙ্গে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয় কিংবা সেটা এক ঘরওলা কিনা, না একই ঘরে বিভিন্ন ব্যক্তিকে

জায়গা দেওয়া হয় তার উল্লেখ নেই। ঘরগুলিতে কি ধরনের বিছানা আছে, বিছানার চাদর বদলানো হয় কিনা, হলে তার জন্য আলাদা চারজ দিতে হয় কিনা, এসবও পর্যটকদের জ্ঞাতব্য বিষয়। আমার মনে হয় দার্জিলিং যদি হঠাৎ না যাওয়া হয়, যদি সময় থাকে, তাহলে এসব বিষয় হোটেলকে আগে লিখে জেনে নিন। যাঁদের অফুরন্ত টাকা নেই, অথচ কতকগুলি অসুবিধে যাঁরা সহ্য করতে পারেননা—তাঁদের সব খবরই রাখতে হবে। যেমন, আমি জানি দু একটি হোটেলে চানের জন্য গরম জল চাইলে তার আলাদা চারজ হয়। অনেকে দাড়ি কামানোর সময় গরম জল পছন্দ করেন, সেসব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চারজ নেওয়া হয় কিনা আমি জানিনা। তবে অনেক সময়েই হোটেলগুলি এমন সব চারজ করেন যেগুলো সম্পর্কে সর্বদা আগে জানা থাকেনা। তা ছাড়া, অনেকেই খাদ্য-সমেত চারজ দিয়ে হোটেলে গিয়ে দেখেন সে সব খাদ্য তাঁদের মুখে রোচেনা। অনেকে মাছ পছন্দ করেন, অনেকে মাংস। কেউ পছন্দ করেন ডিম। এসব বিষয় যাঁরা জানতে চান তাঁরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে পারেন। হোটেল ভাল কি মন্দ, সুবিধে, অসুবিধে, তারপর দৃশ্য দেখার পক্ষে হোটেলটির অবস্থান ভাল কিনা, দার্জিলিংএর কেন্দ্র থেকে হোটেলের দূরত্ব এ সবও আগে থাকতে জানতে পারলে সুবিধে হয়। তবে অনেকেই এত কথা আগে জানতে চাননা। তাঁরা সর্বদাই নিজের বুদ্ধি মত চলতে চান, এবং খারাপ ভাল অভিজ্ঞতা যাই হোকনা কেন তাই মেনে নিতে চান। আমি নিজেও শেষোক্ত দলের। আগে থেকে বেশি হিসেব-নিকেশ করে ছুটিতে বেড়াতে যাওয়া আমার পছন্দসই নয়। অবশ্য তার একটা কারণ আমার আলস্য। অন্য কারণ হল—যদি কোনো জায়গা ভাল না লাগে, তা হলে অন্যত্র যাওয়ার স্বাধীনতা তো রইলই। খাদ্য সম্পর্কেও আমি বাছবিচার করিনা—বিশেষ করে বাড়ির বাইরে। যেখানে যেমন জোটে—একেবারে অখাদ্য না হলেই হল। দক্ষিণ ভারতে আমি দিনের পর দিন দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্য খেয়েছি, কোনো অসুবিধে মনে হয়নি, আবার সম্পূর্ণ সাহেবী খাদ্য খেয়েও আমার অরুচি হয়নি। তবে এসবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। অনেকে লঙ্কা না হলে খেতে পারেননা, অনেকে আবার একটা লঙ্কা ডালে দেখলেই আঁতকে ওঠেন। অতএব কে কি করবেন, কি খাবেন এসব তাঁরাই ভাল বুঝবেন। কোন রেস্তরাঁ ভাল, শস্তা কিনা, এসব স্থানীয় কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করাই

ভাল। তাঁরাই এসব খবর ভাল দিতে পারবেন। তবে যতদূর মনে হয়েছে দার্জিলিংএ ভাল হোটেল আর ভাল খাবার জায়গার অভাব নেই।

যাঁরা একটু "অন্যরকম" প্রিয়, তাঁদের জানাই। এই শহরে তিব্বতীদের কিছু রেস্তরাঁ আছে। সেগুলোতে কয়েকরকম তিব্বতী খাদ্য মেলে। দুটি নাম মনে পড়ছে—থুকপা এবং মোমো। শুয়োরের মাংসে অনেকের রুচি আছে-- তাঁরা একটু চেখে দেখতে পারেন। যদি ভাল লাগে তো এক টাকা দেড় টাকার মধ্যে পুরো 'মিল' না হলেও প্রায় পেট ভরাবার কায়দা পাওয়া যায়। এ খাদ্য অনেকের মতে অখাদ্য বলে মনে হয়, আমার তত মনে হয়না। তবে রুচি নিয়ে কোনো বিবাদ করার দরকার নেই।

১৯৪৮ সালে যখন আমরা লহস জুবিলীতে দৈনিক তিন টাকা দিয়ে ছিলাম তখন বিকেলের দিকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তিব্বতী রেস্তরাঁয় গিয়ে চার আনা এবং ছ আনা খরচ করে ঐ সব খাদ্য খেয়েছি। খারাপ লাগেনি। সর্বশেষ

ভুবন মনমোহিনী

দার্জিলিং-এ দেখার মত অনেক কিছু রয়েছে। প্রথমেই ধরা যাক এর পটভূমি। কাঞ্চনজংঘার ভুবন মনমোহিনী রূপ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বর্ণনায় পাই, "ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গ মুকুট, কিরণে ভুবন আলা"। প্রথম চৌধুরী বলছেন—একটু যেন অখুশি হয়েই, কেন লোকে এখানে আসে? এখানে আছে কি? এখানে হাওয়াও সুখ স্পর্শ নয়, জলও দেখা যায় না :

…হিসেব আলয়ে হেথা বড় অপ্রতুল
সুখস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল।
সুকুমার কুসুমের কি আছে দলিল
এত ঊর্ধে উঠিবার, না হলে বাতুল?
এদেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্বতের শৃঙ্গ,
উজ্জ্বল কিরীটে যার হীরক তুষার।

ক্ষীণ প্রাণে ধরি কোন প্রস্ফুটিত আশা,
এসেছ এ পরদেশে, যেথা নাই ভৃঙ্গ ?—
বরফের বুকে নাহি তোমার সুসার !

কিন্তু এরই মধ্যে পাওয়া যায় ভাল লাগারও যেন আভাস। ডুমুরের ফুল যেমন ফলের আবরণে লুকিয়ে থাকে প্রমথ চৌধুরীর লেখায় যেন আমরা ঠিক সেই ব্যাপারটাই পাই। অর্থাৎ যে ভাবে বলা হচ্ছে, অর্থ যেন ঠিক তেমনটি নয়। তা যদি হত, তাহলে এত কথা বলারই দরকার হত না।

একজন বাঙালী যুবকের দার্জিলিং যেতে ইচ্ছে করে কেন ? "জীবনায়ণ" উপন্যাসে মণীন্দ্রলাল বায় লিখেছেন, "চাদরটা গায়ে টানিয়া লইয়া অরুণ ভাবিতে লাগিল, দার্জিলিঙে এখন তো প্রায় সাতটা হইবে। উমা নিশ্চয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার সদ্য জাগরণ ফুল্ল অনুপম আনন্দে প্রভাতের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। জানালা খুলিয়া দেখিতেছে পাইনবন সূর্যালোকে ঝলমল, রজতকান্তি কাঞ্চনজঙ্ঘা অরুণালোকে ঝলমল করিতেছে। মেঘের সমুদ্রে বিচিত্র বর্ণের লীলা। উমা কি তাহার কথা ভাবিতেছে ?"

"হাঁ দার্জিলিং যাইতে ইচ্ছা করে, উমাকে দেখিতে নয়, টাইগার হিল হইতে এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গে সূর্যোদয়, মেঘলোকে অপরূপ বর্ণোৎসব দেখিতে। অরুণ আবার ভাবিতে লাগিল, না সূর্যোদয় দেখিতে নয়, উমাকে দেখিতে দার্জিলিং যাইতে ইচ্ছা করে।"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং নিয়ে, আমার যতদূর ধারণা—লেখেননি। কিন্তু কাঞ্চনজংঘা তাঁর চোখ এড়ায়নি। দৃষ্টি প্রদীপে তিনি লিখেছেন—

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমার ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্বত প্রাচীর, ওক পাইনের বন, আর্কিড়, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী, মেঘ রোদ কুয়াশার খেলা—এরই মধ্যেই আমরা জন্মেছি—এদের সঙ্গে আমার বত্রিশ নাড়ির যোগ।...তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রাঙা রডোডেনড্রেন ফুলের বন্যা এসেছে..."

আরণ্যক-এ অবশ্য বিভূতিভূষণ অন্য এক রকম পাহাড়রাজি দেখেছেন। সেগুলো হিমালয় নয়, তুষার-শৃঙ্গ তাতে নেই। কিন্তু হিমালয় সম্পর্কে প্রায় সবটাই খাটে।

"চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালা বেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল; বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরি-চূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত; তমসা তীরের পর্ণ কুটীরে কবি বাল্মিকী এক মনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচল চূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্ত মেঘ স্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রম মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সে দিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন; গ্রীকরাজ হেলিওডোরাস গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংবর সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন, যে দিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহা লিখারূপের ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল।...

রবীন্দ্রনাথ শুভ্র তুষার কিরীটিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—লিখেছেন নয়, কবিদের সেটা গান। তিনি গেয়েছেন :—

অয়ি ভুবন মনোমোহিনী,
অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরনী,
জনক জননী-জননী !

নীল সিন্ধুজল—ধৌত চরণতল,
অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র তুষার কিরীটিনা।

রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিংএ বহুবার এসেছেন। কখনো দার্জিলিং পর্যন্ত যাবার আগেই নেমে পড়েছেন তিনধরিয়ায়, কখনো গিয়েছেন কার্শিয়ং, কখনো কালিম্পং। কখনো বা তেতো সিনকোনা ক্ষেত্র মংপু। বারবারই তিনি চেয়েছেন পাহাড়ে আসতে। বিশ্রাম নিতে, স্নায়ুর উত্তেজনা কমাতে। এ বিষয়ে তিনি জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে কবুল করলেন কলকাতা তাঁর জন্মস্থান হলেও সেখানে তাঁর "আবাস্থ" নয়। তিনি ১৯৩৯এর ২৬ আগষ্ট একটি চিঠিতে লিখলেন, "…কলকাতা আমার জন্মস্থান কিন্তু আমার আবাস্থ নয়। শরৎকালে আর্দ্র তাপ দুঃসহ হয়ে উঠেছে—যত শীঘ্র পারি গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় নেব।…" এরই প্রায় দিন পনেরো পর তিনি চললেন "গিরিশৃঙ্গে"। তবে দার্জিলিং শহরে নয়। দার্জিলিং জেলারই একটি অতি মনোরম স্থানে- সিনকোনা ক্ষেত্র মংপুতে। সে বিষয়ে পরে।

দুরাশা গল্পে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিংএর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

"দার্জিলিংএ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয়না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

"হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদ-মস্তক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে, যেন বিধাতা হিমালয় পর্বতশুদ্ধ সমস্ত বিশ্ব-চিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

"জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগেনা, শব্দস্পর্শ রূপময়ী বিচিত্রা ধরনী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

চমৎকার বর্ষার বর্ণনা। বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথও মেঘ দেখতে দেখতে ক্লান্ত, বিষাদগ্রস্ত। অবশ্য এটা গল্প। গল্প হচ্ছে অবশ্যই গল্প—এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতামত খুঁজতে না যাওয়াই বোধহয় ভাল। কিন্তু তবু—মনে হয় কথাগুলির মধ্যে যেন রবীন্দ্রনাথ নিজেও রয়েছেন।

এবারে আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ঐ জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে কিসের আওয়াজ। শব্দ লক্ষ্য করে কাছে গিয়ে দেখা গেল, "গৈরিক বসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণ কপিশ জটাভার চূড়া আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদু স্বরে ক্রন্দন করিতেছে।..."শেষ পর্যন্ত ঐ নারী বলিল, "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।" ঐ নারীকে প্রশ্ন করা হল, "বিবি সাহেব, তোমার এ হাল কে করিল?" তখন "বদ্রাওন কুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন, কে এ সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এত কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে।"

এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেই "সেই হিমাদ্রি শিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকার সঙ্গে মিলাইয়া গেল।"

তারপর আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে গেল। "চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্মল আকাশ ঝলমল করিতেছে, ঠেলা গাড়িতে ইংরেজ রমণী ও অশ্ব পৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাঙালীর গলাবন্ধ বিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।"

এবং তারপর, "দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম, এই সূর্যালোকিত অনাবৃত জগত দৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইলনা।"

হিমালয়ের টানে
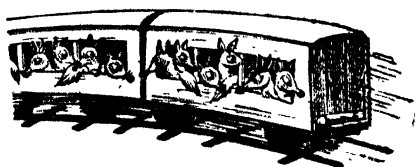
পাহাড় অনেককে টানে, অনেককে টানেনা। রাজশেখর বসুর নকুড় মামার কথাই ধরা যাক। তিনি দার্জিলিং-এ এসেছেন ঠিকই—এসে, "পথের পার্শ্বস্থিত খাদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফার্টার, গায়ে ওভারকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি।" এই নকুড়মামা প্রশ্ন করলেন, "এই দার্জিলিং এ লোকে আসে কি করতে হা? ঠাণ্ডা চাই? কোলকাতায় তো টাকায় এক মন বরফ মেলে, তারই গোটা কতক টালির উপর অয়েল ক্লথ পেতে শুলেই তো চুকে যায়, সস্তায় শীতভোগ হয়। উঁচু চাই—তা না হলে শৌখীন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেনরে বাপু, দুবেলা তাল গাছে চড়লেই তো হয়। যত সব হতভাগা—।"

লেখক মন্তব্য করছেন, "নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আস্কারা পাইয়া হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিং-এ বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়মামা ধর্ম ভীরু লোক অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননা।"

তখন লেখক বললেন, "কি জানেন নকুড়মামা, কষ্ট' পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কিনে। অমৃত বোস লিখেছে—

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

"দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ পরে পাহাড় ডিঙোবার বদখেয়াল হয়েছে। তবে এটুকু আশার কথা—এখানে মাঝে মাঝে ধস নাবে।"

এরপর নকুড়মামা ত্রস্ত হয়ে খাদের কিনারা থেকে সরে রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে এসে বললেন, উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্দর লোকের থাকবার

দেশ ? যখন তখন বিষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তলার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে তো হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি থামলে কাঁপুনি—কেনরে বাপু ?

এই নকুড় মামার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে রাজশেখর বসু বর্ণনা দিচ্ছেন :—

"দার্জিলিং-এ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্‌টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি···জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না···এমন সময় অনতিদূরে···

পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এই ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য মিল, একেবারে যেন অক্ষরে অক্ষরে লেখা। এ লেখা কার—রবীন্দ্রনাথ না রাজশেখরের ? রাজশেখর নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন :—

"এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্য প্রকার,—বদ্রায়নের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুমরাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি সম্পর্ক নির্বিশেষে আত্মীয় - অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা।"

ট্র্যাজিডিই বটে !

মুনশাইন ভিলা, কচি সংসদের সদস্যরা সেখানে রয়েছে। সেদিকেই চলেছেন লেখক। পথের বর্ণনা ভারি চমৎকার :

মনোহারিণী সন্ধ্যা। জনবিরল পথ দিয়া চলিয়াছি। শহরের সর্বত্র—উপরে, আরও উপরে, নীচে, আরও নীচে—স্তরে স্তরে অগণতি দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দুধারে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ী ঝিঁঝির অলৌকিক মূর্ছনা ষড়জ হইতে নিষাদে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুনশাইন ভিলা।"

এমন সময় আওয়াজ।

কিসের শব্দ ? দার্জিলিং শহরে পূর্বে শিয়াল ছিলনা।

বর্ধমানের মহারাজা যে কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে ?"

রাজশেখর বসু একথা কেন উল্লেখ করলেন ? বর্ধমানের মহারাজা হাজার জিনিস থাকতে দার্জিলিং-এ শেয়াল নিলেন কেন ? এটা কি সত্যি ঘটনা ? আমরা আবার ডোরজি-র শরণাপন্ন হচ্ছি। ডোরজি লিখছেন :—

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের আট মাইল দক্ষিণ দিকে "রোজ ব্যাংক"—এটা হল বর্ধমানের মহারাজার বাড়ি। এঁর পূর্ব পুরুষ দার্জিলিং-এ প্রথম শেয়াল আর চিল আমদানি করেন জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ যাতে পচে দুর্গন্ধ না হয়, তার আগেই যাতে এদের পেটে যায় সেজন্য। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু থাকলেও পরে ঐ শেয়ালরা ফেলল মুশকিলে। তারা তো রাত্রের শান্তি নষ্ট করলই, আবার নতুন একটা রোগও আমদানি করল—জলাতঙ্ক।

ডোরজির বর্ণনায় আরও জানা যায় দার্জিলিংএর সুপারিনটেন্ডেণ্ট দার্জিলিং-এ চড়ুই এবং কাক আমদানি করেন। তিনি দার্জিলিং ইমপ্রুভমেণ্ট ফাণ্ডের সহায়তায় দার্জিলিং এ হরেক রকম ইউরোপীয় পাখি এনে ছেড়ে দেন।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আজকাল দার্জিলিং এ যে সব কাকের সাক্ষাৎ পাই, কিংবা চড়ুই—সেগুলো সবই সেই ডঃ ক্যাম্পবেলের আমদানি করা পাখিদের বংশধর ! তবে দার্জিলিং এ আমরা চিল দেখিনি বা শেয়ালের ডাকও শুনিনি। আমাদের অভিজ্ঞতা অবশ্যই কয়েকদিনের। স্থানীয় বাসিন্দারা এ বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হয়।

দার্জিলিংএ লোকে যায় কেন ? নানা লোকে নানা কারণে যায়। কেউ যান স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য—যেমন (স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি থেকে উদ্ধার করছি) :—

অচল গুরোহিমণিমণ্ডিত শিখরাণি
পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃত প্রায়ানপি জনান্
ইতি মণ্যে।

অনুবাদ : আমার মনে হয়, পর্বতরাজ হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। (১৮৯৭)

ঐ বছরেই তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেন : (সম্ভবতঃ বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতেই ছিলেন)

…এই দার্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৮১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমাময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০২ ফুট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা—তিব্বতীরা, নেপালীরা এবং সর্বোপরি সুন্দরী লেপচা মেয়েরা—যেন ছবিটির মতো।

কয়েকদিন পর আবার লিখলেন (এবারে কলকাতা থেকে) :—

ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জিলিংএ ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম-ফ্যারাম দার্জিলিংএ একেবারেই পালিয়েছে।…

প্রায় এক বছর পর স্বামী বিবেকানন্দের অন্যরকম মনে হয়েছিল। তিনি তাঁর অসুস্থতার জন্য দায়ী করলেন দার্জিলিংকে। এবারে লিখলেন :—

আমি জ্বরে শয্যাগত ছিলাম। সম্ভবতঃ অত্যধিক পর্বতারোহন এবং এই স্থানের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য এরূপ হয়ে থাকবে ! আজ আমি আগের চেয়ে ভাল আছি এবং দু একদিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছা করি। কলকাতায় খুব গরম হলেও সেখানে আমার বেশ ঘুম হত এবং ক্ষুধাও মন্দ হতনা। এখানে দুই-ই হারিয়েছি—এই যা লাভ !

দার্জিলিং স্বামী বিবেকানন্দকে হতাশ করলেও হিমালয় তাঁকে হতাশ করেনি। তিনি আলমোড়া থেকে লিখলেন :—

সম্মুখে হিমশিখরানি হিমালয়স্য
প্রতিফলিত দিবাকরকরৈঃ পিণ্ডীকৃত
রজতানীব ভাণ্তি প্রীণয়ন্তি চ।

অনুবাদ : আমার সম্মুখে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের চূড়াগুলি প্রতিফলিত সূর্যালোকে রজতস্তূপের মতো দেখাচ্ছে এবং আনন্দ প্রদান করছে।

[illegible]র মধ্যে দিয়ে চলেছি

দার্জিলিং নয়, হিমালয়েরই অন্য একটা জায়গা। সমস্ত হিমালয়ের মধ্যে একটা জাতের মিল আছে। সে হিসেবে সমস্ত তুষারশিখর পর্বতই আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ দেখছেন তাঁর আশ্চর্য সরল দৃষ্টিতে। সহজভাবে দেখছেন তিনি—বলছেন সহজভাবে। আর তাই যেন কবিতা হয়ে উঠছে :—

"এখানে এসে অবধি হিমালয়কে দেখে নেবার জন্য উঁকি দিচ্ছি—এখানে ওখানে, সকালে সন্ধ্যায়। কিন্তু অচল সে, কুয়াশার ভিতরে কোথায় যে চলে গেছে সপ্তাহ ধরে তার সন্ধানই পাচ্ছি না।

"এ যেন একটা নীহারিকার গর্ভে বাস করছি। দিন এখানে আসছে উত্তাপহীন, অনুজ্জ্বল; রাত আসছে অঞ্জনশীলার মতো হিম, অন্ধকার।"

"আমার চারিদিকে সবেমাত্র দশ-বিশ হাত পৃথিবী গুটি কতক ফুল-পাতা নিয়ে, যেন অগোচরের কোলে এক টুকরো জগৎ; আর

আমরা যেন একঝাঁক দিশেহারা পাখি এইখানটায় আশ্রয় নিয়েছি।
আমাদের কাছে চারিদিক এখনও অপরিচিত রয়েছে। শিল্পী এখনো
যেন তাঁর রঙ-তুলির কাজ শুরু করেননি—সবেমাত্র কুয়াশার শুভ্রতার
গায়ে পার্বত্য দৃশ্যের আমেজ একটু একটু করে দেখে রেখেছেন,
অসম্পূর্ণ, অপরিস্ফুট।"

"রাত্রি শেষে বর্ষা দিগ্‌বধূর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।
আকাশের নীল চোখে সরু একটি কাজল-রেখার কোণে একটুখানি
অরুণ-আভা দেখা যাচ্ছে। আর, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল দেখছি
ধূসরের অচল ঢেউ দিকের শেষ সীমানা পর্যন্ত ; আর রঙও নেই, রূপও
নেই! এই অবিচিত্রতার মধ্যে একটিমাত্র পাহাড়ি ফুলের কুঁড়ি, বসন্তের
নববধূ সে, আলোর প্রতিক্ষা করছে। প্রজাপতির পাখার চেয়ে
সুকুমার এবং পাপড়িগুলি, এত ছোট, এত কচি—একেই ঘিরে আজ
প্রভাতের সমস্ত সুর। সুদূর গিরিশিখরে, মেঘ লহরীর তীরে, বনের
পাখির কণ্ঠে, নীহারের যবনিকা ঠেলে বাহিরে ছুটে এসেছে পর্বতের
কলভাষী দুরন্ত শিশু এই যে জলধারা—এর ঝরে পড়ার মধ্যে।"

"কাঁচা সোনার একটিমাত্র আভা, বসন্ত বাউরির বুকের পালকের
অস্ফুট বাসন্তী আভা, সকালের আকাশে বিকীর্ণ হয়ে গেল। এই
আলোর উপরে সব-এখন তুষার, আজ সে সোনার পটে যেন কাজলের
রেখার মতো কালো হয়ে ফুটে উঠল।"

"এই কালো বরফের নিষ্কলঙ্ক ললাট! এইখানে বসন্ত দিনের,
তরুণ দিনের, প্রথম আশীর্বাদ পড়েছে ; সে একটিমাত্র আলোর করকা।
আর তারই আভা তুষারের সহস্র ধারায় হিমালয়ের অন্ধকার আলো
করে গড়িয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে ফুল ফোটার ছন্দটি ধরে।"

একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্নভাবে দেখা দেয়। যে পর্বত শিল্পী ও
কবির কাছে প্রেরণা, তাই নকুড়মামার কাছে যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার। কচি-
সংসদের কাছে যা গান, অন্যের কাছে তাই একদল শেয়ালের ডাক! বিভিন্ন
মানুষের কাছে একই জিনিস যেমন বিভিন্ন লাগে, তেমনি একই মানুষের মত
বদলায়, কেননা মানুষও বদলাতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এক বছরের মধ্যেই

দার্জিলিং সম্পর্কে বিরূপ হলেন। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য চিরকালই পর্বতকে ভালবেসেছেন। তাঁর ভাল লাগায় কোনো ভেজাল নেই।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের দার্জিলিং যাত্রা সম্পর্কে লিখেছেন :—

> ওরে টেলিস্কোপটা নিয়ে যেতে ভুলিসনে। সেটা কোথায় গেল দেখতো!
>
> পুরনো বই-এর সারি দেওয়া বই-এর পেছনে ধুলোর মধ্যে পড়েছিল চামড়ার খাপে মোড়া বহুদিনের দূরবীনটা। দাদামশায় সেটাকে নিয়ে পরিষ্কার করতে বসলেন।
>
> এটাকে নিয়ে যেতে হবে দার্জিলিং-এ।
>
> দার্জিলিং যাবার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।
>
> দাদামশায় এটা বাছছেন ওটা বাছছেন। রঙ তুলি কাগজ বোর্ড লাঠি আর ঐ টেলিস্কোপ।
>
> —পাহাড়ে অনেক দূরে চোখ চলে। দূরবীণ না হলে চলে?

অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গে নিলেন দূরবীণ। যাঁরা দার্জিলিং যাবেন, সম্ভব হলে একটা বাইনোকুলার নিয়ে যাবেন। মনে পড়ে দুরবীণকে সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজংঘা'র সেই পাখি-দেখা দূরবীণ হাতে ভদ্রলোককে সঙ্গে নিলে সারাটা দিন কোনো একটা জায়গায় বসিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায়, দূরে জিনিস কাছে এনে তা দেখে দেখে!

আর নিতে হয় ক্যামেরা। যাঁরা নিজেরা ছবি আঁকতে পারেননা, তাঁদের তো লাগেই, আর লাগে যাঁরা ছবি আঁকতে পারেন তাঁদেরও! ছবি আঁকার চোখই ক্যামেরার ছবি কি ভাবে তুলতে হবে তা বলে দিতে পারে।

এবারে মোহনলালের বর্ণনা তুলে দিচ্ছি। পুরণো যুগে যখন লোক দার্জিলিং যেত তখন ঝামেলা—বিশেষ করে জিনিসপত্রের, কম ছিল না!

> রীতিমত লটবহর নিয়ে তবে দার্জিলিং যাওয়া। গোছগাছ করতে ক-দিন চলে গেল। নীল রং-এর ডোরা-কাটা বড় বড় শতরঞ্চি মুড়ে ঢাউস ঢাউস বিছানা বাঁধা হল। পেট-মোটা কাঠের সিন্দুকে বাসন-কোসন। টিনের আর চামড়ার ট্রাঙ্ক-এ গরম কাপড় জুতো মোজা গেঞ্জি। আর ঝুড়ি ভরা খাবার রাস্তায় খাবার জন্য।

ট্রেনে ভোরবেলা টেনে তুলেছেন আমাদের। সোজা উত্তর মুখো চলেছে ট্রেন, তখনও শিলিগুড়ি পৌছুতে কিছু দেরী। নীল আকাশের বুকে হিমালয় বরফ চুড়ো পূব থেকে পশ্চিম অবধি টানা। দাদামশায় বলছেন—দেখে নে, দেখে নে। ঐ দেখ মহাদেব শুয়ে আছেন নাক উঁচু করে।

ভোরের আকাশের পটে হালকা সাদায় আঁকা আমরা কি আর দেখেছি কখনও? আমরা তো হাঁ হয়ে গেছি। দাদামশায় এদিকে ট্রেনের মধ্যে মহা হই-চই লাগিয়ে দিয়েছেন।—টেলিস্কোপটা গেল কোথায়? কোন বাক্সে রাখা হয়েছে? কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গেল নাকি হারিয়ে? ফেলে আসা হল নাকি বাড়িতে?

দাদামশায় হতাশ হয়ে বললেন—গেল এতদিনের দূরবীণটা। দার্জিলিং যাওয়াটাই দেখছি এবারে মাটি।

শুনে দিদিমা বললেন—যাবে কেন? তোমার দূরবীণ তো বড় বিছানার মধ্যে প্যাক করা হয়েছে।

বড় বিছানা মানে সে এক বিরাট ব্যাপার। গদি, তোশক বালিশ, লেপ, কম্বল থেকে আরম্ভ করে জুতো, লাঠি, আমাদের খেলনা-পত্র বই সব কিছু তার মধ্যে। চারদিকে তার আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে এমন করে বাঁধা যে ট্রেনের কামরায় তাকে খোলা অসম্ভব।

দাদামশায় শুনে বললেন—ওঃ তাই বল। যা ভাবনা হয়েছিল। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন—কাঞ্চনজঙ্ঘাকে চট করে তোদের হাতের কাছে এনে দেব ভেবেছিলুম। তা দেখছি তোদের কপালে নেই।

আমরা তখনও মুগ্ধ হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য দেখছি।

পাঠকরা আবার প্রথম দিকে শিলিগুড়ি প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারেন। প্রায় সমতল থেকে হঠাৎ দিগন্তে সোনার রঙের চূড়া দেখার বিস্ময় কিছুতেই কাটে না। বহুবার একথা বলার পর, বহুবার এদৃশ্য দেখার পরও এই বিস্ময় অনেকের মনেই অব্যাহত থাকে।

এবার দার্জিলিং গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁর দলবল কি করলেন দেখা যাক।

বাড়ি থেকে বেড়িয়ে চললুম দু-জনে গাছপালার আড়ালে আড়ালে। বেশ শীত। দাদামশায়ের গায়ে পা পর্যন্ত ঢাকা লম্বা তিব্বতী বকু, মাথায় মখমলের টুপি। আমার গায়ে বেখাপ্পা ওভার কোট, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে শীতে কুঁকড়ে চলেছি। মুখের উপর ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া কিন্তু ভারি চমৎকার লাগছে। পাকদণ্ডি দিয়ে খানিকটা উঠেই দাদামশায় থামলেন। ঘন গাছের আড়ালে খানিকটা ফাঁক। তারই মধ্য দিয়ে দেখা যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ো। ঠিক যেন ফ্রেমে আঁটা একখানা ছবি। বরফের রঙ তখনও পাঙাশ, যেন মৃতের মতো।

দাদামশায় বললেন—এক্ষুনি জেগে উঠবে। দেখনা কি কাণ্ড হয়। তুই দাঁড়া ওখানটায়। আমি একটু বসি। বলে একখানা ওপড়ানো পাইন গাছের উপর বসে বকুর পকেট থেকে থেকে একটা বর্মা চুরুট বার করে ধরালেন।

আমাদের চোখের সামনে কুয়াশা আস্তে আস্তে ভোরের আলোয় সরে য'চ্ছে। খানিক পরেই কোথা থেকে আলো এসে পড়ল বরফের চূড়োয়। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যেতে থাকল বরফের চেহারা, আকাশের চেহারা! জেগে উঠতে লাগল পৃথিবী—

দার্জিলিং-এ আসতে হয় কেন, তার একটা চমৎকার উত্তর পাওয়া গেল উপরের এই বর্ণনায়।

কিন্তু দার্জিলিং সকলকেই ভাল লাগতেই হবে এমন কোন কথা নেই। অবনীন্দ্রনাথের দলে ছিল হরিদাসী-ঝি—সকলের মত সেও শীতে কাঁপত আর এক-ঘেয়ে সুরে বলে যেত—এ কোন্ দেশে আনলে গো? এদেশ যে এদের বড্ডো ভাল লেগেছে গো! এরা যে খাবার নামটি করেনা গো! এরা কবে যাবে গো! ভাল লাগেনি এডোয়ার্ড লিয়ারেরও। তিনি ছবি আঁকতে গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ, গত শতাব্দীর শেষের দিকে। তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে আপন করে ভাবতে পারেননি। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "The himalayas, altogether, were a disappointment to him. He refues to be impressed."

কিন্তু হরিদাসী-ঝি এবং এডোয়ার্ড লিয়ারদের সংখ্যা পৃথিবীতেই কম। অতএব দার্জিলিং-এ ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এক এক সময় দার্জিলিং এক এক রকম। প্রতিটি বাঁকে বিস্ময়—মনে চাঞ্চল্য এনে দেয়। পরিমল গোস্বামী লিখেছেন :—

> আমরা প্রায় মেঘের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। নিচের বিস্তীর্ণ সমতল-ভূমি ; যা মাঝে মাঝে দৃশ্য হয়ে আবার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কখনও দূরের পাহাড়ের গায়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। কখনও সাদা মেঘের স্তর জমে আছে দূরে পাহাড়ের গলার কাছে। পাহাড়ীরা দলে দলে পায়ে চলার পথ বেয়ে চলেছে। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। সব মিলিয়ে মনের মধ্যে একটা অপূর্ব চাঞ্চল্য জেগে উঠেছে।···

দার্জিলিং যাঁদের ভাল লাগেনা, তাঁদের কোথায় ভাল লাগে জানতে ইচ্ছে করে। তবে, অনেকে মনে করেন কালিংম্পং দার্জিলিং এর চেয়েও ভাল। কেউ আবার বলেন, কেন মিরিক ? মিরিকের মত জায়গা আর হয়না! অনেকের অবশ্য পাহাড়-ই ভাল লাগেনা। একজন গোমড়া মুখো ইংরেজ নাকি স্থইজারল্যাণ্ডের বরফমণ্ডিত পর্বত দেখে এসে বলেছিলেন, জায়গাটা মন্দ নয়—তবে কিনা ভাল ভাল দৃশ্যকে সবই পাহাড় এসে নষ্ট করে দিয়েছে !

দার্জিলিংএর চেহারা

১১৬৪ বর্গমাইল। দার্জিলিং এর ঠিকানা হচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে অক্ষাংশ ২৬°-৫৩´ থেকে ২৭°-১৩´। দ্রাঘিমাংশ ৮৭°-৫৯´ এবং ৮৮°-৫৩´। বন-জঙ্গলের জন্য সংরোক্ষন এলাকা ৪৪৮ বর্গমাইল। দার্জিলিং-এর নামকরণ হয়েছে—কারুর মতে এখানকার আদি বুদ্ধ উপসনালয় থেকে আগে এর অবস্থিতি ছিল ম্যাল-এর উপরকার পাহাড়ে। ইংরেজরা এর নাম দিয়েছে অবজারভেটরি হিল। দার্জিলিং অনেকটা অসমান চেহারার ত্রিভুজ-এর মত দেখতে। এর উত্তর সীমানায় রয়েছে ফালুট-এর চূড়া। এটা হল নেপাল, সিকিম ও ভারতের সঙ্গম। ফালুট-এর উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট। ফালুট থেকে পূব দিকে সীমান্ত বরাবর যেতে যেতে পড়বে রাম্মাম নদী। এখন থেকে রাম্মাম নদীই হল দার্জিলিংএর সীমানা বেশ কিছুদূর—তারপর এসে গেলাম রঙ্গিত নদী—এবার এটাই হল এর সীমানা। রঙ্গীত নদী এসে যুক্ত হল তিস্তার সঙ্গে। তারপর তিস্তা ধরে যেতে যেতে এল রংপো চু। যে সব পাঠক মানচিত্র দেখতে দেখতে মানস ভ্রমণ করতে পারেন

তাদের উচিত হবে একটা বড় আকারের মানচিত্র যোগাড় করে চোখ বুলিয়ে যাওয়া, এবং অবাক হয়ে দেখা, যে এই ছোট্ট জেলার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য খরস্রোতা নদী, সমতল ক্ষেত্র ৩০০ ফুট, কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চলে উঠে গেছে বারো হাজার ফুট পর্যন্ত। ভৌগোলিক হিসেবে তরাই ভারতের সমতল ক্ষেত্রেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন এটা হল একটা নিরপেক্ষ স্থান। তরাই এর অনেক অংশই পাহাড়ী যেমন নয়, তেমনি সমতল ক্ষেত্রের মত পলিমাটি দিয়েও গড়া নয়। তরাই হচ্ছে তরাই—আর এর মধ্যে রয়েছে পালাক্রমে বিস্তির্ণ বালির বিছানা—পর্বত থেকে ধসে পড়া, স্রোতের টানে আনা ছোট বড় পাথরের টুকরো। এককালে এই অঞ্চল ছিল অস্বাস্থ্যকর—আর মানুষ এদিকে আসতে ভয় পেত। তরাই-এর জঙ্গলে ছিল ভয়ানক ভয়ানক সব জানোয়ার। তাদের কেউ কেউ এখনও প্রবল বিক্রমে দেখা দেন। কিন্তু মানুষ এখন অনেক নিরাপদ। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সমতল ক্ষেত্রে আসাটা যেন আকস্মিক। হঠাৎ যেন পাহাড়টাকে দেওয়াল বলে মনে হয়। উঁচু পর্বত থেকে নিচের দিকে দেখলে মনে হয় পাহাড় এবং সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে মাঝারি কিছু নেই। হঠাৎ যেন পাহাড় শেষ হয়ে সমতলক্ষেত্র সুরু হয়েছে।

পাহাড়ী অঞ্চলে যে রকম উপত্যকা সাধারণতঃ হয় দার্জিলিংএ সে রকম কিছু নেই। পাহাড়ী অঞ্চলের নদী যথেষ্ট, কিন্তু নদীর উপত্যকা তেমন বিস্তৃত নয়। পাহাড়ের উঁচুর দিকে বড় বড় গাছ, আবার খুব বড় বড় অঞ্চল পরিষ্কার করে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বেঁটে বেঁটে চা গাছের সারি। আবার গহন জঙ্গলেরও দেখা মেলে।

দার্জিলিং জেলার সব নদীই শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে গতি নিয়েছে। তিস্তা নদী সিকিম থেকে বেরিয়েছে ২১ হাজার ফুট উঁচু এক হিমবাহ থেকে। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত মিলিত হয়েছে বাংলাদেশের রঙপুর জেলায়। দার্জিলিং জেলায় তিস্তার সঙ্গে মিশেছে রংপো, রিলি, গ্রেট রঙ্গিত, রিয়াং এবং সিভোক। তিস্তা নদীর স্রোত প্রচণ্ড, আর বিপজ্জনকও—কোথাও কোথাও এর গতি ঘণ্টায় ১৪ মাইল। আর এই নদীর জল কখন হঠাৎ কমে যাবে বা বেড়ে যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। সেজন্য এর কাছাকাছি যাঁরা থাকেন তাঁদের সাবধান হতে হয়। যখন তিস্তার জল কম থাকে তখন এর রঙ হয় সমুদ্র-সবুজ।

বর্ষাকালে প্রবল স্রোতের সঙ্গে অনেক মাটি এসে মেশায় এর রঙ ঘোলাটে হয়ে পড়ে। তিস্তা নদী যতক্ষণ পাহাড়ে পর্বতে ততক্ষণ এর চেহারা ভীষণ, ভয়ানক। যেন ধারালো তরোয়াল। কিন্তু যে মুহূর্তে তিস্তা সমতলে এসে পড়ে সেই মুহূর্তে এর চেহারা হয়ে পড়ে বিরাট। শিলিগুড়ির সিভোক ব্রিজের কাছে সমতল ক্ষেত্রে তিস্তার এপার-ওপার ঠাহর হয়না।

তিস্তা নদীর দৃশ্য পাহাড়ে পর্বতে অতি চমৎকার। যাঁরা দার্জিলিং শহরে যান, তাঁরা অবশ্য এর রূপ দেখতে পাননা। তাই এটা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, যে দার্জিলিং শহরই যে কেবল দেখবার মত তা নয়। এর আশে-পাশে প্রায় সর্বত্রই কিছু-না-কিছু দেখার আছে। যাঁরা ডায়েরি লেখার খাতায় বিখ্যাত নাম, যেমন দার্জিলিং, কার্সিয়ং, ঘুম, টাইগার হিল এসব লিখতে চান এবং অন্যত্র ভাল ভাল দৃশ্য থাকলেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননা, তাঁদের কথা আলাদা। যাঁরা পরিশ্রম করতে চাননা, কিংবা একটু ঝুঁকি নিতে চাননা তাঁদের কথাও আলাদা। কিন্তু যাঁরা একটু 'অন্যরকম' কিছু চান তাঁদের বলব, তাঁরা যেন দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী নদীগুলির দু একটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে তিস্তাকে বাদ দেওয়া কোন মতেই উচিত হবেনা। গ্রীষ্মকালটা পাহাড়-পর্বত ভাল লাগবে ঠাণ্ডার জন্য, কিন্তু একবার শীতকালে চলে আসুন শিলিগুড়ির কাছাকাছি—এর কাছে রয়েছে অসংখ্য নদী আর পাহাড়, চা-এর বাগান, রেইন-ট্রি। চমৎকার!

ফিরে আসা যাক আবার দার্জিলিং শহরে। রোম তো একদিনে তৈরি হয়নি। কোনো শহরই না—অবশ্য আজকাল হঠাৎই শহর গড়ে ওঠে, চণ্ডীগড়, দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেলা যেমন গড়ে উঠেছে। একটা শহরের বাড়ি ঘরই তার পরিচয়, আর রাস্তা।

এবারে দৃষ্টি চালানো যাক অতীতের দিকে। কিভাবে তিল তিল করে দার্জিলিং নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে, বাড়ি তুলেছে তার পরিচয় এখানে দেওয়া যাক :

১৭৬৫—অবজারভেটরি হিলের বুদ্ধমন্দির

১৮৪৩—সেণ্ট অ্যানড্রু'স চার্চ

১৮৪৭—লোরেটো কনভেণ্ট

১৮৪৮—জলপাহাড়ের স্বাস্থ্য উদ্ধার কেন্দ্র

১৮৫১—হিন্দু মন্দির

১৮৫২-৬২—জুম্মা মসজিদ

১৮৬৪—সেণ্ট পল'স স্কুল—জলাপাহাড়

১৮৬৫—কবরখানা (পুরনো)

১৮৬৫—জেল

১৮৬৭—জলাপাহাড় ও কাটাপাহাড় সেনানিবাস

১৮৬৮—দার্জিলিং প্ল্যাণ্টার্স ক্লাব

১৮৬৮—কনভেণ্ট কবরখানা

১৮৬৯—ইউনিয়ন চ্যাপেল

১৮৭০—দাতব্য চিকিৎসালয়

১৮৭৪—ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুল

১৮৭৬—ঘুম-এর বুদ্ধমন্দির

১৮৭৭—বার্চ হিল পার্ক

১৮৭৮—লয়েড বোটানিক গার্ডেন

১৮৭৯—শ্রাবেরি—পরে গভর্নরের বাড়ি

১৮৭৯—কার্সিয়ংএ ভিক্টোরিয়া বয়েজ' স্কুল

১৮৭৯—বুদ্ধমন্দির ভুটিয়া বস্তি

১৮৭৯—সেণ্ট জোসেফ'স চার্চ—জলাপাহাড়

১৮৮০—ব্রাহ্মমন্দির

১৮৮৩—ইডেন স্যানিটারিয়াম

১৮৮৭—লইস জুবিলি স্যানিটারিয়াম

১৮৮৮—সেণ্ট জোসেফ'স কলেজ, নর্থ পয়েণ্ট

১৮৮৮—লেবং সেনানিবাস

১৮৮৯—সেণ্ট মেরি'স ট্রেনিং কলেজ—কার্সিয়ং

১৮৮৯—সেণ্ট ল্যুকস—জলাপাহাড়

১৮৯০—সেণ্ট হেলেন'স কনভেণ্ট—কার্সিয়ং

১৮৯১—রেল স্টেশন

১৮৯২—লজ মাউণ্ট এভারেস্ট

১৮৯৩—চার্চ অফ দি ইম্যাকুলেট কনসেপশন

১৮৯২—সেণ্ট কলম্বাস চার্চ

১৮৯৫—কুইন'স হিল গার্লস স্কুল

১৮৯৬—বুদ্ধমন্দির—গিং

১৮৯৬—পুরনো ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড

১৮৯৭—নিউ কাছারি

১৮৯৮—সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস

১৮৯৮—ডাউ হিল গার্লস স্কুল (কার্সিয়ং)

১৮৯৯—দি ভিজিটর্স প্রেস

১৯০০—রিঙ্ক থিয়েটার

১৯০০—কলোনিয়াল হোমস (কালিম্পং)

১৯০৩—ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল

১৯০৪—ডায়োসেশান গার্লস হাইস্কুল

১৯০৫—গল্ফ লিংকস

১৯০৭—গেথাল'স মেমোরিয়াল স্কুল—কার্সিয়ং

১৯০৭—হিন্দু পাবলিক হল

১৯০৭—পারসী কবরখানা

১৯০৮—মহারাণী গার্লস স্কুল

১৯০৯—প্লেগ্রাউনড

১৯০৯—নতুন কবরখানা

১৯১০—তাকদা সেনানিবাস

১৯১২—লজ লেবং

১৯১৩—চীনা ক্লাব

১৯১৪—গভর্নরের বাসস্থান সম্প্রসারিত

১৯১৪—গভর্নরের কর্মীদের হাসপাতাল

১৯১৪—স্মল-পক্স হাসপাতাল

১৯১৫—ন্যাচুরাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম

১৯১৫—হোটেল মাউণ্ট এভারেষ্ট

১৯১৫—সাউথ ফিল্ড

১৯১৫—ব্লুমফিল্ড ব্যারাকস

১৯২১—টাউন হল

আমরা এখানে মোটামুটি দার্জিলিংএর প্রথম প্রায় ৮০ বছরের হিসেব পাচ্ছি। তারপরও ষাট বছর চলে গেছে—আরও নতুন নতুন অনেক কিছু হয়েছে। দার্জিলিং-এর চেহারা ক্রমশঃ ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে। জমির দাম ওখানে বাড়ছে ক্রমাগত। ব্যবসা-বাণিজ্য আরও প্রসারিত হচ্ছে। পর্যটকদের জন্য নানা রেস্তরাঁ, কিউরিও শপ, তিব্বতীমালা, পুতুলের দোকান খুলেছে। ফোটোগ্রাফির সাজ-সরঞ্জাম, ফিল্মের দোকান, জামা-কাপড় গেঞ্জির দোকান—এসব প্রচুর। আর চোখে পড়ে উল-এর রাশি। তিব্বতীরা উলের ডাঁই নিয়ে রাস্তার ধারে বসে গেছে। ঝটপট করে তারা বুনছে। যেন মেশিন। প্রতি বল উলের দাম এখানে কম। কলকাতায় যার দাম সাড়ে চার বা পাঁচ টাকা, এখানে তারই দাম তিন টাকা। এটা কি করে সম্ভব তা আমাদের বুদ্ধিতে কুলোয়না। আরও বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলেনা সেটা হল'এখানে একটা পুরো স্যুট বানানোর খরচ এখন একশো পঞ্চাশ টাকা—আর কলকাতাতে নেমে এলেই তার খরচ দুশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো!
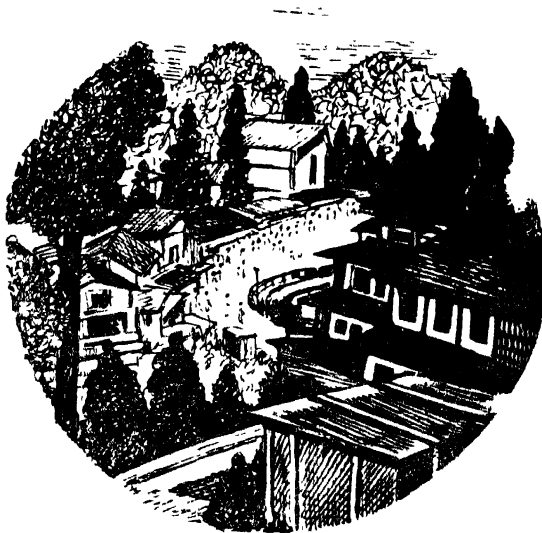
দার্জিলিং-এ কি করা যায়

এ প্রশ্নের সরাসরি, সরল এবং বিতর্কহীন কোনো উত্তর নেই। এটা অবশ্যই নির্ভর করবে মানুষের রুচির উপর। কেউ সেখানে যান স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। কেউ বা নিছকই ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দার্জিলিং গড়ে ওঠার মূলেও ছিল ঐ উদ্দেশ্য। আর একটা কারণ ছিল গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য। কেউ, ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কয়েকদিন কেবলি শুয়ে থাকার জন্যই দার্জিলিং গিয়েছেন এমন ঘটনাও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ওখানে ইডেন ল্যাবরেটরিতে বসে নাতি শীতল থেকে অতি শীতল অঞ্চলের গাছপালার জীবনের ধরণ-ধারণ নিয়ে পরীক্ষা করতেন। যাঁরা গাছ দেখতে চান—বিশেষ করে ইউরোপীয় গাছ, তাঁদের তো দার্জিলিং-এবং তার কাছাকাছি অঞ্চল একেবারে স্বর্গরাজ্য। যাঁরা নানাবিধ বিদেশী ফুল দেখতে চান তাঁদেরও দার্জিলিং অভিমুখে একবার যাওয়া দরকার। তবে অনেকে বলবেন, বিদেশী ফুল কেন, ওরা তো এখন এদেশী ফুলই। তা ছাড়া পৃথিবীর

অনেক গাছপালার আদি যে হিমালয়ে সে বিষয়ে এখন উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন। দার্জিলিং এর আশে পাশে নানা রকম জন্তু জানোয়ারদেরও দেখা মেলে, সে কারণেও এই অঞ্চল যাবার মত জায়গা বটে।

প্রকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছপালা—এসব ছাড়া অবশ্যই রয়েছে—ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গমালা। এবং তারপরও মানুষ তার নিজের মত করে কোনো জায়গাকে পেতে চায়। কেউ ভালবাসেন বাজার। বাজার পৃথিবীর সর্বত্র একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর এক বাজার থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলের সবজী, লোক জন বেশভূষা এসবের। এজন্য, তাঁর বেশ খানিকক্ষন কেটে যাবে ঐ অঞ্চলের পরিচয় পেতে পেতে: মানুষের মন যত কল্পনাপ্রবনই হোক না কেন, বাজারের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম জানলে আপনিই সে "ডাউন-টু-আর্থ" হতে বাধ্য! আর সব সময়েই তো সেই, পুরনো সেই দিনের কথা—আহা, কী ভালই না ছিল সে সব দিন! এই ভেবে মানুষ এক ধরণের আনন্দ এবং কষ্ট, এক সঙ্গেই পেতে পারে!

দার্জিলিং যখন প্রধানত সায়েবদের জায়গা ছিল, তখন যে সব ফল মূল সবজী ইত্যাদি পাওয়া যেত সেগুলি হল—আপেল, নারকেল, পেয়ারা, কাঁঠাল, লিচু, লেবু, আম, কমলালেবু, পেঁপে, পীচ, আনারস, কলা এবং প্লাম। এ ছাড়া সমতল ক্ষেত্র থেকে আমদানি করা সমস্ত রকম ফল। বীন, শালগম, বেগুন, বাঁধা কপি, গাজর, ফুলকপি, সিলিরি, শসা, লীক, লেটিস, তরমুজ, খরমুজ, মিথ, পার্সলি, মটরশুঁটি, আলু, সাধারণ এবং মিষ্টি কুমড়ো, রাবার্ব, আখ, টুম্যাটো ইত্যাদি।

এবারে দামের কথা। পুরনো আমলের "স্বর্ণ দিন" ছিল সেসব! 'দি দার্জিলিং অ্যাডভারটাইজার' থেকে কতকগুলি জিনিসের দাম উল্লেখ করা হল, এই উদ্দেশ্যে যে আজকের মানুষ এই দামের সঙ্গে আজকের দামের তুলনা করে যুগপৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন এবং আনন্দ পাবেন। আনন্দ পাবেন এই ভেবে, যে, আজ থেকে সত্তর বছর পর আজকের দামই হয়ে যাবে অতীতের দাম, এবং তখনকার মানুষেরা অবাক হয়ে যাবে আজকাল মানুষেরা কী সুখেই ছিল এই ভেবে!

পাঁঠা বা ভ্যাড়ার মাংস, সাড়ে তিন সের এর দাম একটাকা বারো আনা থেকে

তিন টাকা। গরুর মাংসের দাম 'ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত'। মুরগী টাকায় ৩টে থেকে ৫টা, রঙ্গীত নদীর মহাশোল মাছ টাকায় চার সের, কিন্তু "সারাঘাটের বরফ ঘরে রাখা মাছ আমাদের এক টাকা চার আনা সেরে কিনতে হয়।" আলু এক মন দু টাকা কিন্তু এখন (অর্থাৎ মে জুন মাসে চার টাকা) সবজীর দাম খুবই বেশি—ট্রয়েট-লারের ক্ষেত থেকে কিংবা জেল থেকে যা পাওয়া যায়। জেল থেকেই "এখনও" সবচেয়ে বেশি সবজী সরবরাহ হয়। একটা পায়রার দাম তিন আনা কি চার আনা। পোর্ক বা হ্যাম চমৎকার—হ্যাম এক পাউণ্ড এর দাম আট আনা। আর দুধ! টাকায় কখনো দশ সের কখনো বার সের। মাখন এক পাউণ্ড বারো আনা, ডেনিশ রুটিওলা শোউ এর তৈরি সাত পাউণ্ড রুটি এক টাকায়"।

এবারে আর কি—বাজারটা ঘুরে আসুন। বাজারে যাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। আপনি দার্জিলিং এ এলে আপনাকে রোজ একবার করে 'ম্যাল' এক এ আসতেই হবে—আর যদি তা না করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনি অন্য জাতের মানুষ। তা যদি হন তাতে ক্ষতি নেই, কেননা মানুষ প্রকৃতির মতই বৈচিত্র্যময়। যাইহোক ম্যাল-এ এসে যদি গোটা কয়েক মার্বল ছেড়ে দেন তাহলে সেগুলোর মধ্যে দুটি নিশ্চয় গড়াতে গড়াতে বাজারে গিয়ে হাজির হবে। আর তা করতে লাগবে দু মিনিট। আপনার, হাঁটতে লাগবে মিনিট কয়েক, কিন্তু বাজার থেকে ম্যাল মিনিট কয়েকের পথ নয়। খাড়াই বেয়ে উঠতে একটু হাঁফ ধরতেও পারে তেমন অভ্যাস না থাকলে। সময় লেগে যাবে বেশ কিছু।

এবারে দার্জিলিং-এর দ্রষ্টব্যের একটা তালিকা দিই। এর মধ্যে সবই অবশ্য ঠিক যে দ্রষ্টব্য তা নয়। কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় যেমন রেলওয়ে স্টেশন। এটিকে এমন সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে যে দেখে মুগ্ধ হতে হবে।

বরং বলা যায় দার্জিলিংএর মত সুন্দর জায়গায় এর শ্রী একটু আলাদা। এরকম ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে এই শহরে। বিশেষ করে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আর বিদ্যুতের তারের সমারোহে বহু সুন্দর সুন্দর দৃশ্যকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। সুন্দর শহরকে সুন্দরতর করা যেখানে আবশ্যিক সেখানে তিলে তিলে সেটাকে খারাপ করা হলে মন খারাপ হয়ে যায়। যেমন কলকাতার শ্রী হচ্ছে—ফুটপাতের উপর পাকাপাকি চালাঘর দোকানঘর তৈরী হচ্ছে সব, কোনো

অভিভাবক আছে বলেও মনে মনে হয় না। সম্প্রতি, ১৯৭৭ এর নভেম্বরে দার্জিলিংএর এস কে মুখারজি নামক এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, জলাপাহাড়ের সেন্ট পল'স স্কুলে যাবার রাস্তা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছে—। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির পাহাড়ী পথ ভারি লরি চলাচলের উপযোগী নয়, কিন্তু তাও চলছে, আর সে জন্য কয়েক বছর হল ঢালাও পারমিটও দেওয়া হচ্ছে। মিউনিসিপ্যাল ঝাড়ুদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু তারা তাদের কাজ খুব কমই করে। কয়েকটা হঠাৎ হঠাৎ পর্যটন উৎসব করে কি আর এই শহরের উন্নতি করা যায় ?

ঠিক যেন কলকাতার অবস্থা। বা, সকল দেশেরই অবস্থা। এ থেকে যেন আমাদের পরিত্রাণ নেই।

দার্জিলিংএ যাওয়ার আগেই পড়বে ঘুম। সেখানে রয়েছে বুদ্ধমন্দির। এখান থেকে কিছু দূরে আঁকা বাঁকা পথে যাওয়া যায় সিঞ্চলহ্রদ এবং টাইগার হিল-এ। সিঞ্চলে রয়েছে গল্ফ কোর্স্ আর খাববার জায়গা।

এই ঘুম থেকেই রাস্তা চলে গেছে সান্দাকফু—সুখিয়া পোখরি আর মানে—ভঞ্জন হয়ে।

ঘুমএর পর দেখবার মত জায়গা হল রেলের একটা লুপ। নাম বাতাসিয়া।

তারপর হিল কার্ট রোড ধরে চলতে চলতে ডান দিকে পড়বে সাঁই আর্ট গ্যালারি। কিছুদূর গিয়েই ডান দিকে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস, আর বাঁ দিকে আভা আর্ট গ্যালারি। এখানে একটু উপরের দিকে তেনজিং-এর বাড়ি। বাঁদিকে নিচে বর্ধমান মহারাজার বাড়ি। কার্ট রোড দিয়ে আবও একটু গেলে বাঁদিকে পড়বে ভিক্টোরিয়া ফলস।

একটু পরেই দার্জিলিং রেল স্টেশন।

এরই কাছে লুইস জুবিলি স্যানিটারিয়াম। এর কাছে ধীরধাম মন্দির।

স্টেশনের কাছে ম্যাল-এর দিকের রাস্তা চলে গেছে। অনেকগুলি রাস্তা রয়েছে এখানে পর পর—একটা থেকে আর একটাতে সহজেই যাওয়া যায় আর প্রায় প্রত্যেক রাস্তা ধরে উপরের দিকে গেলেই ম্যাল-এ পৌছান যায়। দার্জিলিং শহরের মাঝখান দিয়ে শিরদাঁড়ার মত চলে গেছে কার্ট রোর্ড। আর এই কার্ট রোডের দুধারে দার্জিলিং—একটা মানচিত্রে এই রাস্তাগুলিকে সম্মিলিত

ভাবে দেখায় লম্বা গলাওলা একটা জিরাফের মত, কিন্তু মুখটা যেন—একটা ঘোড়া একটু উঁচুর দিকে মুখ করে রয়েছে। রেল স্টেশনের কাছ থেকে দুটো রাস্তা উঠে গেছে—তার একটা হল আর কে কুশারী রোড, সেটা গিয়ে পড়েছে গান্ধী-রোডে। উত্তর দিকে এবার কিছুদূর গেলেই অগুনতি দ্রষ্টব্য এবং প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যাবে। যেমন রেড ক্রস বিল্ডিং, ইউনিয়ন চার্চ, নিউ-এভারেস্ট লাকশারি হোটেল, ইনডিয়ান এয়ার লাইনস্-এর অফিস, পোস্ট অফিস, স্টেটব্যাংক, গ্রিণ্ডলে'জ ব্যাঙ্ক, ক্যাপিটল থিয়েটার, প্ল্যানটার্স ক্লাব, ডি অ্যাণ্ড ডি এম এ হাসপাতাল, সেণ্ট্রাল রোড, গভঃ কলেজ গোসটেল এবং টুরিস্ট ব্যুরো। এখান থেকে আবার উত্তরে চলুন—ম্যাল ছাড়িয়ে ডান দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাসগৃহ স্টেপ অ্যাসাইড। এরই নাম সি আর দাস রোড। আর একটু উত্তরে গেলে ভুটিয়া বস্তী মন্দির। সেখান থেকে আঁকা-বাঁকা পথে লেবং যাওয়ার সহজ উপায়। অথবা কার্ট রোড ধরে নর্থ পয়েন্ট বরাবর গিয়ে তারপর ডান দিকে ঘুরেও লেবং যাওয়া যায়—গাড়িতে করে এই দূরের পথে যাওয়াই ভাল। টুরিস্ট ব্যুরো থেকে উত্তরে যেতে একটু বাঁদিক ভেঙে পড়বে সদর হাসপাতাল। লেবং কার্ট রোড ধরে লেবং-এর দিকে যেতে যেতে ডান দিকে একটা গলির মধ্যে পাওয়া যাবে তিব্বতীদের রিফিউজি সেণ্টার। হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনসষ্টিটিউট নর্থ পয়েণ্টের কাছে বার্চ হিল-এ। এর নতুন নামকরণ হয়েছে জওহর পর্বত।

লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন পাওয়া যাবে টুরিস্ট লজ থেকে—বা ম্যাল থেকে পশ্চিম দিকে নেমে কার্ট রোড পার হয়ে।

ম্যাল থেকে ভানুভক্ত সরণি দিয়ে কিছুদূর গেলে পাওয়া যাবে সরকারি টুরিস্ট লজ, আর তা থেকে খানিকটা দূরে গেলেই পাওয়া যাবে রাজ্যপালের বাড়ি।

চিড়িয়াখানা রয়েছে হিমালয় মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের কাছেই। এখান থেকে একটু এগিয়ে গেলে নর্থ পয়েন্ট। সেখানে রয়েছে রোপওয়ে। কাছেই সেণ্ট জোসেফস কলেজ।

এ ছাড়াও দার্জিলিং-এ আছে আরও কিছু "দ্রষ্টব্য" জিনিস। সেগুলির তালিকা এখানে দেওয়া হল—যাঁদের প্রয়োজন হবে তাঁরা খুজে নেবেন। টুরিষ্ট অফিস

থেকে সুন্দর মানচিত্র বিক্রী হয়—যারা পায়ে হেঁটে ঘুরতে চান তাদের পক্ষে সত্যিই সেটা অপরিহার্য। দাম মাত্র এক টাকা।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলির নাম :

বিটি কলেজ, ক্যাথলিক চার্চ, চক বাজার, দার্জিলিং জিমখানা ক্লাব, ইডেন হাসপাতাল, ফায়ার ব্রিগেড, গান্ধী পার্ক, লোরেটো কলেজ, মসজিদ, ন্যাচুরাল হিষ্ট্রি মিউজিয়াম, ঘোড়ায় চড়ার জায়গা (ম্যালের উপর), শৈলাবাস টুরিস্ট লজ, ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে ফায়ার ব্রিগেড বা ইডেন হাসপাতাল ঠিক "দ্রষ্টব্য" বলা যায়না। লোরেটো কলেজও নয়—এগুলি হল শহর-চিহ্ন। ল্যাণ্ডমার্ক।

আসলে দার্জিলিং-এর দ্রষ্টব্য এর ঘর বাড়ি নয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখেছিলেন, "...দার্জিলিং-এর আসল শোভা ঘর বাড়িতে নয়, সে হচ্ছে মেঘের আর হিমালয়ের আর আলো আর ছায়ার শোভা।"

হিমালয়ের রূপ সম্পর্কে উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার লিখে গেছেন, হিমালয়ের মতই তার তুলনা হয়না। এক জায়গায় লিখেছেন, "অনেক দিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি; পাহাড়ের পিঠের উপরে মেঘের খোকারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিমালয়ের ঝাপসা ছেয়ে রঙের চূড়াগুলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য উঠেনি, পুবের আকাশে লাজুক হাসির মতো একটু আলো দেখা দিয়েছে মাত্র। ক্রমে হিমালয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠতে লাগল, ব্যস্ত হয়ে রঙ ঢেলে তুলি নিয়ে বসলাম, মনে হল কতই কিছু আঁকব।"

কিন্তু আঁকা হলনা! তিনি লিখছেন, "দুষ্ট মেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেচারাও তাদের বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তারপর এক পা দুপা করে, না জানি কোন দেশের পানে তারা রওয়ানা হল। হিমালয় দিল ঢেকে, আমার আঁকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা পাহাড় বন বাড়ি ঘর সব গ্রাস করে ফেলল! তখন আর আশপাশের বাড়ি ঘর গাছপালা কিছুই দেখবার জো নেই। আমাদের বাড়িখানা যে মজবুত পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পক রথের মতো শূন্যে উড়ে পরীর মুলুকের পানে ছুটে চলছেন, একথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে উঠল। আবার তার দশ মিনিট পরেই দেখা গেল যে মেঘ সব উড়ে গিয়ে চারদিকে রোদ ঝকমক করছে।"

মেঘেরা সারাদিনই খেলা করছে। তার বর্ণনা উপেন্দ্রকিশোর বারবার দিয়েছেন। হিমালয়ের মেঘের এত ভাল বর্ণনা আর আছে বলে আমার জানা নেই। অবশ্য কালিদাসও লিখেছেন (বাংলা অনুবাদ একটু খটমট শোনাবে) :—

> "হে মেঘ! জলবর্ষণ কণার পরে তুমি বন্যাহস্তীর সুগন্ধী মদজলে সুরভির জমুকুচ্ছে নিরুদ্ধবেগ নর্মদার জল গ্রহণ করিয়া গমন করিবে। অন্তঃসার সম্পন্ন তোমাকে বায়ু প্রকম্পিত করিতে পারিবে না। অন্তঃসার শূন্য সকলই লঘু হয়, সারবত্তা গৌরবের কারণ।"

কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর-এর মত অত সহজ ভাষায় আর কে লিখবেন ?

> "সারাদিন ভরে এমনিতর খেলা। কখনো গেঁড়ির মতো হানা দিয়ে পাহাড় বেয়ে ওঠে, কখনো ভেড়ার পালের মতো পাহাড়ের গায়ে বসে দল বেঁধে বিশ্রাম করে, কখনো বিশাল দৈত্যের মতন উঠে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি আড়াল করে ফেলে। ঐ যে ভারী ভারী মেঘগুলো জল ঢেলে আমাদের ভাসিয়ে দেয়, তাদের এক-একটা যে কত উঁচু, তা এখানে এলে বেশ বুঝতে পারা যায়।…এমনিতর খেলা। তারপর সন্ধ্যাবেলায় শীত লেগে, আবার হয়তো তাদের ঘুমের কথা মনে হয়; অমনি তারা পাহাড়ের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, না হয় দুই পাহাড়ের মাঝখানের গর্তে নেমে, তাকে পরিপূর্ণ করে, বিশ্রাম করতে থাকে। দেখলে মনে হয়, না জানি কোন ধুনুরী মেঘের তুলো ধুনে রেখে দিয়েছে, তা দিয়ে ঘুম পাড়ানী মাসীর লেপ তয়ের হবে।"

উপেন্দ্রকিশোরের রচনা থেকে সবটাই তুলে দিতে ইচ্ছে করে। তবে স্থানাভাব। এখন আর একটু কেবল দেওয়া যাক :—

> "মনে কোরনা যে রোজই এমনতর হয়। এর শোভা নিত্য নতুন। কখনো বা মেঘে আর রোদে মিলে পাহাড়ের গায়ে রঙ-বেরঙের ঢেউ খেলিয়ে চোখ জুড়িয়ে দেয়, কখনো-বা ঘড়-ঘড় গর্জনে দিক্-বিদিক্ আঁধার করে, দিনের পর দিন খালি জলই ঢালতে থাকে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুরাশা গল্প দ্রষ্টব্য। আর স্মরণীয় অবনীন্দ্রনাথের :—

> "মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি। কুয়াশার সুবিমল শিশির চুম্বন মুখে

লাগছে, চোখে লাগছে, প্রাণের ভিতর পর্যন্ত স্পর্শ করছে পথের ক্লেশ-ক্লান্তি ধুয়ে মুছে।

"পাহাড়ের একটি অন্ধকার কোণ। লতাপাতার ভিতর থেকে একটি জলপ্রপাত নেমেছে; তারই উপর অপরিসর সেতু ছত্রাকে-ভরা জীর্ণ একখানি কাঠের উপর ভর দিয়ে রসাতলের দিকে চেয়ে রয়েছে। একখানা বিশাল পাথর অতলস্পর্শ অন্ধকারের উপরে ঝুঁকে রয়েছে; আর তারই তীরে বনদেবীটির মতো বনলতা পুঞ্জ পুঞ্জ তারা ফুলের একটি মাত্র গুচ্ছ। জলের হাওয়ায় কাঁপছে কুচি পাখির ডানা দুখানির মতো দুটি লতা বল্লরী—; আর তারই পাশ দিয়ে ফেনিল জল চলেছে অট্টরোলে অতলের মুখে। ঝাঁপিয়ে-পড়া, গড়িয়ে-চলা, তলিয়ে-যাওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডাক! অনেকখানি জুড়ে দূরে দূরে পর্বতে পর্বতে রণিত হচ্ছে এই নিরুদ্দেশের দিকে নৃত্য করে চলে যাওয়ার, এই গহনের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝনৎকার!

"মেঘ রাজ্যের উপরে উঠে এসেছি। প্রকাণ্ড অজগরের নির্মোকের মতো একখণ্ড কুয়াশা সমস্ত গিরিশ্রেণীটি বেষ্টন করে নিশ্চল হয়ে আছে।"

ম্যাল-এর বৈঠকখানায়

তা-একবার না একবার এখানে তো আসতেই হবে। অনেকেই দার্জিলিংএ এসে আর কোথাও যায়না। তাঁরা ম্যাল-এর খুব কাছাকাছি একটা হোটেলে থাকেন দু-একদিন এদিক ওদিক ঘুরে আড্ডা গাড়েন ম্যাল-এরই আশে পাশে। এর একটা অসাধারণ অকর্ষণ রয়েছে যা খুব কম লোকই এড়িয়ে যেতে পারেন। যাঁরা খাদ্যরসিক তাঁরা জানেন ম্যাল এবং তার আশে পাশেই পাওয়া যায় সেরা সেরা খাদ্য, আর যাঁরা মনে করেন শস্তায় খাবেন, তাঁদের জন্যও রয়েছে ঐ ম্যাল। আর কলকাতায় বা নিউইয়র্কে কী কী ফ্যাশন চলছে তাও দেখবারি একটাই জায়গা—ঐ ম্যাল! নিজেদের পোশাক পত্র, গয়না গাঁটি দেখাবেন? দার্জিলিং-এর ম্যাল-এর মত জায়গা আর কি আছে? ম্যাল হচ্ছে একটা সিনেমার পরদা—ওখানে বসে থাকুন কোথাও, সঙ্গে একটা বাইনোকুলার থাক, কাজে লেগে যেতে পারে—কোনো পাখি যদি নাও পান, একটা দুটো সুন্দরী অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আর সুন্দরী যদি চোখে না পড়ে তাহলে কী আর করবেন, পাখিই না হয় গোটা কয়েক দেখে নিন, এবং অরনিথোলজিক্যাল একসপার্ট হিসাবে নাম কিনে ফেলুন। পাখি পাবেন, গাছ পাবেন, মানুষ পাবেন নানা রকম। বাঙ্গালি, লেপচা, ভুটিয়া এবং নেপালী—নেপালীদের সংখ্যাই বেশি। এডওয়ার্ড লিয়ার এই দার্জিলিংএ এসেছিলেন, এবং লিখেছিলেন :—

> There was an Old Man of Nepaul
> From his horse had a terrible fall ;

But though split quite in two, by some
Very strong glue,
They mended that Man of Nepaul

তবে যাঁরা নেপালীদের ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখবেন বলে আশা করবেন তাঁদের কিন্তু হতাশই হতে হবে। কেননা, পাহাড়ী ঘোড়ায় চড়তে এবং পাহাড়ী ঘোড়াদের নিয়ন্ত্রণ করতে তাদের মত আর যদি কেউ থাকে তা হল অন্য জাতের পাহাড়ীরা। আমরা সমতল ক্ষেত্রের মানুষ, আমাদের কাছে পাহাড়ে চড়া আর ঘোড়ায় চড়া ব্যাপারটা সমান অসুবিধেজনক। যাই হোক—আপনি ম্যালে এলে তারই একটা কোণের দিকে বেশ তীব্র একটা গন্ধ পাবেন, তাতে নাকে রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলতে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। এখানেই ঘোড়াদের আস্তাবল—এখানে গিয়ে আপনি ঘোড়া অল্প সময়ের জন্য ভাড়া নিতে পারেন। অনেকেই নিয়ে থাকেন, কোনো ভয় নেই। ঘোড়ায় ওঠা এবং চালানোর মত সহজ কাজ আর নেই। তবে কিনা, ঘোড়ায় চড়ার আগে একটা উঁচু টুল হলে ভাল হয়, আর সহিস যদি ঘোড়ার গলার সঙ্গে বাঁধা দড়িটা নিয়ে সামনে সামনে চলতে থাকে তাহলে তো উত্তম। অনেক প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও আমি এবং আমার এক বন্ধু ১৯৪৮ সালে ঘোড়ায় চড়িনি। তার প্রধান কারণ ছিল ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়। যদিও তার আগে কখনই ঘোড়ায় চড়িনি, তবুও মনে হয়েছিল ঘোড়ায় চড়লেই পড়ে যাব। এটা কি জানি না—কেউ বলেন এটা হল হর্স সেনস্! হতে পারে।

গল্পটা বলে নিই। খুব উপাদেয় গল্প নয় এটা—আগেই পাঠক-পাঠিকাদের সাবধান করে দিচ্ছি। আমি আর আমার বন্ধু পুলক ম্যালে ঘুরছি। সেখানে আবিষ্কার করলাম আমাদের বন্ধু অমল-এর দুই ভাই অসীম এবং অরুণকে। তারা আমাদের কাছে এগিয়ে এল এবং দু মিনিট যেতে না যেতেই প্রস্তাব করল আমাদের ঘোড়ায় চড়তে হবে। আমাদের তখন এ জ্ঞানটা হয়েছে যে দার্জিলিংএ কিছু করতে হলে নগদ কিছু অন্তত গুণে দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বললাম, না ভাই—ঘোড়ায় চড়তে আমাদের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। কিন্তু অসীম আর অরুণ কিছুতেই ছাড়তে চায় না—তাদের ক্রমাগত আবদার—

দার্জিলিংএ এসেছেন, একবার অন্ততঃ ঘোড়ায় চড়তেই হবে। এখানে যে আসে সে একবার ঘোড়ায় চড়েই। পুলক তখন গম্ভীরভাবে বলল, এখানে এসে সবাই যা করে তা করতে আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই! তখন অরুণ বলল, না না তা ঠিক নয়—যারা সাহসী, অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, তারা ঘোড়ায় চড়ে, কাপুরুষেরা চড়েনা।

আমরা কাপুরুষ হয়েই রইলাম সেদিন। পুলক পরে বলল, উঃ কী সাংঘাতিক প্রস্তাব—আমি শুনেছি ঘোড়াওলারা পনের মিনিটের জন্য ছ আনা চার্জ করে—মরসুমের সময় আরও বেশি।

ছ আনা আর ছ আনা, মানে কমপক্ষে বারো আনা! ও দিয়ে থুকপা হয় এক প্লেট। মোমো হয় এক প্লেট। বারো আনা কি কম? সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটি পয়সা কেউ দেয় না।

সেদিনকার মত আমরা রেহাই পেলাম।

পরদিন আবার অসীম-অরুণের সঙ্গে দেখা। তাদের সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন। তারা আমাদের আবার ধরে ফেলল—বলল, ঘোড়ায় চড়ুন না হিমানীশদা, পুলকদা! কোনো ভয় নেই—ঘোড়ারা অতি শান্ত। বলে নিজেদের মধ্যে কেমন যেন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল, আর আমার মনে হল ওরা কি যেন একটা মতলব করছে। যাকে বলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—তা যেন জানিয়ে দিল—খবরদার ঘোড়ায় মোটেই চড়া নয়! ঘোড়ায় মোটেই চড়া নয়।

পুলক তখন বলল, তোমরা যতই বলনা কেন ঘোড়ায় চড়তে—আমরা কিছুতেই তাতে রাজী নই। জানো ঘোড়ার চড়ার খরচ?

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, তা আর জানিনা—পনের মিনিটের জন্য আট আনা।

—আট আনা? আমরা তো ছ আনা ভেবেই ঘাবড়াচ্ছিলাম। পুলক বলল, তবে? আট আনা কি কম?

অরুণ বলল, আপনারা যদি চড়তে রাজি থাকেন তাহলে আমি পয়সা দিয়ে দেব।

অতি লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই।

পুলক বলল, তা যদি তোমরা দিয়ে দাও…।

আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললাম, না—না—না! ঘোড়ায় চড়ব না।

অসীম বলল, কেন—কেন?

আমি বললাম, আজ না হয় তোমরা পয়সা দিচ্ছ—কিন্তু ধরো কাল যদি এসে আবার ঘোড়ায় চড়তে ইচ্ছে হয় তাহলে তোমাদের তো পাবনা। তখন তো আমাদেরই পয়সা খরচ হয়ে যাবে। যাবে কি-না বলো তোমরা?

অসীম বলল, কালই আবার চড়তে ইচ্ছে করবে কেন?

আমি বললাম, কি থেকে কি হয় কে বলতে পারে? যে প্রথম সিগারেট ষোল বছর বয়সে সহজে টানতে শুরু করে সে কি করে জানবে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তাকে তা ছাড়বার জন্য নিজের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতে হবে! সে জানেনা—আর সে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সিগারেট ছাড়তেও পারে না—অধিকাংশ লোকই তা পারেনা। ধরো আজ ঘোড়ায় চড়লাম—কাল চড়লাম—তারপর এইভাবে এমন অভ্যেস হয়ে গেল যে ঘোড়া ছাড়া চলেনা, তখন কি করব আমরা?

অসীম, অরুণ সেদিন খুবই হতাশ হয়েছিল। কিন্তু একেবারে হাল ছাড়েনি তারা। আমরা এরপর দার্জিলিং-এ যতদিন ছিলাম ততদিনই তারা আমাদের ঘোড়ায় চড়ার জন্য প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমরা আমাদের জেদ বজায় রাখতে পেরেছিলাম। আমরা যেদিন ফিরে যাব সেদিন অসীম, অরুণ বাস পর্যন্ত পৌছে দিতে এল। কথায় কথায় অরুণ বলল, হিমানীশদা, আপনারা দারুণ চালাক!

—কেন? আমরা চালাকীর কি করলাম?

অরুন বলল, আপনারা যে ঘোড়ায় একবারও চড়লেন না!

আমরা বললাম, কেন চড়লাম না তাতো তোমাদের বলেছি।

অরুণ বলল, আমাদের আনন্দটা মাটি করে দিলেন।

—কেন, কেন?

অরুণ আর অসীম তখন বলল, প্রতি বছরই তারা তাদের পরিচিত লোকদের ঘোড়ায় চড়তে প্রলুব্ধ করে—শতকরা ৯০ ভাগই রাজি হয়ে যায় আর তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় একশো ভাগের কপালেই ঘটে অদ্ভুত অকটা ব্যাপার।

কী ব্যাপার?

জানা গেল অরুণ আর অসীমেরা একটা ঘোড়াওলাকে চেনে যার একটা বিশেষ "দুষ্টু" ঘোড়া রয়েছে। সেই ঘোড়ার নাম ডায়না। ওরা তার নাম দিয়েছে ডাইনী। ওর ওপর চড়লে ও প্রথমে কিছু বলেনা—তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে সহিস যখন তাকে ছেড়ে দেয়—তখন ঘোড়াটা ছুটে চলে যায় আধমাইল, আর আরোহী কোন মতে সেই ঘোড়াটার উপর এঁটে থাকে।

আধমাইল যাওয়ার পর ঘোড়াটা পাগলের মত নাচতে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আরোহী তার উপর থেকে পড়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ সে থামে না। অনেক সময়ে এমন হয়েছে ঘোড়া দশমিনিটে ফিরে এসেছে, আরোহী ফিরেছে দুঘণ্টা পর ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজ বেঁধে।

এবারে সেরকম কাউকেই পাওয়া গেলনা। আক্ষেপ করল অরুণ আর অসীম। অনেক আশা করেছিলাম ·।

শিবরাম চক্রবর্তী 'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি' করেছেন, দার্জিলিংএর পটভূমিকায়, গল্পও লিখেছেন, কিন্তু কখনো দার্জিলিং যাননি। ১৯৭৭ এর ডিসেম্বর মাসে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, তাঁকে প্রশ্ন করে জানলাম তিনি দার্জিলিং কখনও যাননি। কলকাতায় আসার পর মাত্র দুটি জায়গায় তিনি এযাবত গেছেন—এক হল দেওঘর, আর দ্বিতীয় জায়গা হল ঘাটশীলা। শিবরামের "চেঞ্জে গেলেন হর্ষবর্ধন" গল্পের প্রথমেই দেখতে পাই :—

> দার্জিলিং গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর সখ হলো দুই ভাইএর।
>
> 'ঘোড়ায় চড়া একটা ভালো এক সাইজ, জানো দাদা?' বললো গোবরা।
>
> 'তা আর জানিনে, তবে ঘোড়া দুটো একসাইজের হয়ে গেলো, এই যা মুশকিল।'

এরপর রহস্যের পর রহস্য। সে গল্প সম্পূর্ণ উদ্ধার না করলে মারখাবে, আর সম্পূর্ণ উদ্ধার করতে গেলে প্রকাশক আমাকে মারবেন। অতএব সম্পূর্ণ উদ্ধার করা গেলনা। তবে একটা কথা বলা যায়, ম্যাল-এ গিয়ে ঘোড়ায় চড়া খুব যে বিপজ্জনক তা নয়। সামান্য কিছু দুর্ঘটনা হয়ত কালেভদ্রে ঘটে। কিন্তু কোনো স্পোর্টস-ই সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কিছু একটা ঝুঁকি নিতেই হয়।

একটা ভরসার কথা—দার্জিলিং-এর ঘোড়া থেকে পড়লে লাগবে কম। গায়ে

প্রচুর উলের জামা থাকবে, আর ঘোড়াগুলোর আকারও ছোট। এর উপর থেকে পড়া অত বিপজ্জনক নয় তবে ঘোড়ায় না চড়েও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা চলে লেবং রেস কোর্সে। সেখানে গরম কালে ঘোড়ার দৌড় হয়। দেখবার মত সে দৌড়ে, আর পয়সা টয়সা থাকলে বাজি রেখে একেবারে ফতুর হওয়ারও বাধা নেই।

একটা কথা লেবং প্রসঙ্গে বলার আছে। এই ঘোড়ার দৌড়ের মাঠে ১৩৪১ সালে কয়েকজন বাঙালী যুবক তৎকালীন লাটসাহেবকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে। "আততায়ী বলিয়া কয়েকজন বালক ও যুবক ধৃত হইয়াছে।" প্রবাসীর ১৩৪১ সালের জৈষ্ঠমাসে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

ম্যাল-এ গেলে কলকাতার অনেক কেউ-কেটার সাক্ষাৎ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় পোশাক-আশাক দেখিয়ে অন্যদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার বিপুল আয়োজন। এই কারণেই কচি সংসদএর গৃহিনী বলেন, "ছাং ডালহাউসি, দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন ঝাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়ো পোকা কেনা হ'ল—সেই যে বোআ না কি বলে—আর—হীরে বসানো চরকা ব্রোচ—তা এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সে সব দেখবে কে? দার্জিলিঙে বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, স্বকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি মিস্ত্রিরের বৌ তার তেরোটা এঁড়ি গেঁড়ি ছানাপোনা নিয়ে গেছে।"

অতএব চলো দার্জিলিং—এবং ঘুরতে ফিরতে সেই ম্যাল!

ম্যাল থেকে দূরে

যাঁরা হাঁটতে ভালবাসেন আর ম্যাল থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে চান তাঁদের জন্য সুসংবাদ আছে। দার্জিলিং-এ যে সব জায়গা রয়েছে সেগুলো হেঁটে হেঁটে দেখা শেষ করে ফেলুন। তারপর চলুন বাইরে। দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত হাঁটা খুব শক্ত নয়—মাত্র ছ কিলোমিটার। ঘুম থেকে টাইগার হিল ৫ কিলোমিটার। ঘুমকে কেন্দ্র করে যাওয়া যেতে পারে বিজনবাড়ি—২৮ কিলোমিটার। একদিনের পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বিজনবাড়ি যেতে হলে লিটল রঙ্গীত নদী পার হতে হবে। ঘুম থেকে সুকিয়া পোখরি যাওয়া চলে। দূরত্ব এগারো কিলোমিটার। সেখান থেকে পথ মিরিকের দিকে চলে গেছে। কাছেই মানেভঞ্জনে—নেপাল সীমান্ত। মানেভঞ্জন থেকে পথ দুদিকে চলে গেছে—জিপে যাওয়া যায় এমন রাস্তা গেছে পালমাজুয়া পর্যন্ত, তারপর কেবল হাঁটা পথে যাওয়া রিমবিক। তারপর আরও উত্তরে রামাম, এবং ফালুট। আবার মানেভঞ্জন থেকে অন্য রাস্তাটি ধরে ১১ কিলোমিটার দূরে মেগমা, সেখান থেকে টংলু হয়ে গৈরিবাস, কালপোখরি এবং তারপরই বিখ্যাত সান্দাক-ফু।

তবে হাঁটা পথে যেতে খরচ কম পড়ে তা নয়। সঙ্গে একজন শেরপা নেওয়া অনেকে দরকারী বলে মনে করেন। হেঁটে অনেক দূর বেড়ানোকে ইংরিজিতে বলে ট্রেক। ট্রেকিং এখন ইংরাজি জানা জগতে খুবই চালু বাক্য। অনেকে সান্দাক-ফু পর্যন্ত যাওয়ার জন্য সঙ্গে একটা ছোট ঘোড়া রাখতে চান, জিনিসপত্র বয়ে নেওয়ার জন্য—যাতে হাঁটাটা খুব নির্বাধায় হতে পারে। উঁচু-নিচু পাহাড়ী

পথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ধনী দেশগুলিতে নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। হালকা বিছানা—যাকে বলে স্লীপিং ব্যাগ, যাতে সঙ্গে লেপ তোষক ইত্যাদি না নিলেও চলে। একরকম স্লীপিং ব্যাগ পাওয়া যায় যা হাওয়া ভর্তি করলে হাওয়ার বিছানা হয়ে যায়, আর তারপর হাওয়া বের করে দিলে একটা ছোট প্যাকেটের মধ্যে সেটাকে রাখা চলে। কিন্তু এরকম বিছানার সবচেয়ে সুবিধে গরমকালে। শীতকালের জন্য অপেক্ষাকৃত ভারি স্লীপিং ব্যাগ পাওয়া যায়। হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইনসটিটিউটে উৎসাহী ব্যক্তিরা খোঁজ নিতে পারেন। তবে আগেই বলেছি হেঁটে বেড়ানো ব্যাপারটা মোটেই সস্তা নয়—বিশেষ করে ঠাণ্ডা পাহাড়ী অঞ্চলে।

কখন হাঁটবেন? যাঁরা হাঁটতে চান তাঁদের কাছে কোন বাধাই বাধা বলে মনে হবে না, এক 'ঘন ঘোর বরিষা' ছাড়া। তবে সরকারী লিফলেট-এ দেখতে পাচ্ছি লেখা রয়েছে নভেম্বর পুরো এবং ডিসেম্বরের প্রথমার্ধ হেঁটে বেড়ানো, বা ট্রেকের পক্ষে উপযোগী। কারণ আর কিছু নয় তখন আকাশে এবং পর্বতে মেঘ কম। কুয়াশা এসে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে না—দৃশ্য দেখা যাবে অতি চমৎকার ভাবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। যাঁরা সমতল ক্ষেত্রে দিনে দশ মাইল সচ্ছন্দে হাঁটতে পারেন তাঁরা পাহাড়ে গিয়ে হেঁটে দেখে নিন সেখানে অত সচ্ছন্দে হাঁটতে পারছেন কিনা। উঁচু নিচুতে চলা অভ্যেস না থাকলে অসুবিধে হতে পারে—আর হতে পারে বায়ুচাপ কম থাকার জন্য। হাওয়ার চাপ কম থাকলে অকসিজেনও কম পাওয়া যায়—যদিও পনের হাজার ফুট উঁচু পর্যন্ত অকসিজেন মারাত্মক রকম কম থাকে যে তা নয়, তবু কিছু কম থাকে বলে ঘন ঘন দম নেওয়ার দরকার হতে পারে। সঙ্গে ভারি বোঝা থাকলে কষ্ট বাড়তে পারে। সেজন্য যাঁরা পাহাড়-পথে ট্রেক করতে চান তাঁদের দরকার তার দু মাস কি তিন মাস আগে থেকে সমতল ক্ষেত্রে একটু বেশি ভারি জিনিস নিয়ে দীর্ঘ পথ নিয়মিত ভাবে চলা অভ্যেস করা। আবার যাঁরা শহরে থাকেন তাঁরা তো খুব উঁচু উঁচু বাড়িতে ভারি জিনিস নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা নামাও করতে পারেন নিয়মিত। এইভাবে

কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে? জন হিলারি নামের একজন ইংরেজ স্থির করেন তিনি একা একা ইংল্যাণ্ড সফর করবেন—যে সব রাস্তায় গাড়ি চলে সে সব

রাস্তা দিয়ে যতদূর সম্ভব না চলা যায় সেটা মনে রেখে। তিনি বলছেন, "আমি সবচেয়ে কম জিনিস নিয়েছিলাম—যতখানি কম নেওয়া সম্ভব। সঙ্গে একটা তাঁবু রেখেছিলাম যাতে কোথাও রাত্রি হলে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে টুরতে না হয়। এতে নিজেকে বেশ স্বাধীন বলে মনে হয়। আমি অবশ্য এটা বলতে চাই না যে আরাম আমার পছন্দ নয়—যদি কোথাও একটা সরাইখানা বা হোটেল জুটে যায় তাহলে আমি খুশি হয়েই সে সব জায়গায় আশ্রয় নিই। তবে ঐ রকম অস্থাবর আশ্রয়ের প্রয়োজন আমার ছিল না ··আমি রুকস্যাকের ওজন যাতে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ডের বেশি না হয় সেটার উপর নজর দিয়েছিলাম।···জামা কাপড়ের সমস্যাটা তেমন নয়—যাতে খুব বেশি ঠাণ্ডাও না লাগে, আবার গরমেও হাঁসফাঁস না করতে হয় এমন পোশাকই পরতে হয়। সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হল সমস্ত দিন যাতে পোশাক পরে সাচ্ছন্দ্য বোধ করা যায়। আমি কিনেছিলাম হাওয়া নিরোধক জিপ ফাস্‌নার দেওয়া অ্যানোরাক। সকালে আমি পুরো জিপ বন্ধ করে যাত্রা শুরু করতাম আর আস্তে আস্তে চলতে চলতে আমি যখন নিজেই নিজের উত্তাপ সৃষ্টি করতাম তখন জিপ ফাস্‌নারটা একটু একটু খুলে হাওয়া ঢোকাতাম।···আমি কখনই বেশি মাত্রায় ভিজিনি, আমার জানা ছিল ভিজে এবং ঠাণ্ডা এ দুটির একত্র সমাবেশে মৃত্যু প্রায় সুনিশ্চিত। এই কারণে আমার হালকা ওজনের সুতীর তাঁবুর উপর টেরিলিন এর হালকা ওয়াটার প্রুফ আটকে দিতাম। যখন আবহাওয়া খুব খারাপ হত—তখন এমনকি দিনের বেলাতেও আমি হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢুকে পড়তাম। রাত্রে ঘুমাতাম চীনে হাঁসের পালক দিয়ে তৈরি লেপ ভর্তি স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে। যখন ওর মধ্যে ঢুকতাম তখন মনে হত আমি যেন স্বর্গে রয়েছি। ওজন ছিল তিন পাউণ্ড—আর ওটার জন্য খরচ পড়েছিল খুবই···জুতোর ব্যাপারটা একটু গোলেমেলে···অনেকেই বলেন মোটা বুট আর মোটা মোজা দরকার এসব ক্ষেত্রে —কিন্তু সেগুলোর মত অত খারাপ ব্যাপার আর আমার জানা নেই। ভারি বুট পায়ে দিয়ে পথ চলা শক্ত।···আমি টেনিস শু পরে মরুভূমিতে ঘুরেছি, কিন্তু বৃটেনে তা অচল, কেননা সহজেই ভিজে যায়। আমি এক জোড়া ইটালিয়ান জুতো কিনেছিলাম, যে গুলির এক একখানার ওজন ছিল পোনের আউন্স (দুটো মিলে এক কেজির কম)। তারপর ট্রেনিং—এরজন্য আমি দিয়েছিলাম তিন

মাস সময়। প্রতিদিন হ্যাম্পস্টেড থেকে লণ্ডনের ব্যবসা কেন্দ্র অবধি আমি বেশ ভারি রুকস্যাক নিয়ে সকালে হাঁটতাম, আর উইক-এণ্ডের সময় আরও বেশি দূর। এইভাবে আমি নিজেকে ট্রেইন করতাম।”

তিনি আরও লিখছেন :—যাত্রার সময় রুকস্যাক ভরে নিয়েছিলাম একটা বাইনোকুলার, একটা ক্যামেরা, ওষুধপত্র, নোটবই, আর গাছপালা পাথর সহজে চিনতে সাহায্য করে এমন বই। খাদ্য না পেলে তার জন্য যোগাড় রেখেছিলাম ভিটামিনযুক্ত ফার্জ। কিন্তু সেরকম অবস্থা কখনই হয়নি।”

তাই ট্রেক মানে খুব সহজ একটা ব্যাপার নয়। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। হিমালয়ের উপরে খোলা আকাশে শুয়ে ঘুম দেওয়া কাজের কথা নয়—সেরকম অবস্থা অনেকের পক্ষেই সহ্য করা কঠিন। অতএব সঙ্গে তাঁবু দরকার। নইলে আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া দরকার পথের আশ্রয়। অনিশ্চিতের মধ্যে অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয় বটে, এবং কখনও তা ভালও লাগে, কিন্তু আহার এবং বাসস্থান এই দুইএর জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল। পুরনো যুগে সায়েবরা সেজন্য চালু করেছিল ডাক বাংলো।

পুরনো আমলে কোথায় কোথায় ডাক বাংলো ছিল তার একটা হিসেব আমি যোগাড় করেছি। এগুলো এখনো আছে কিনা, থাকলে ঠিক ভাবে রাখা আছে কিনা—বিছানাপত্র কিরকম, খাদ্যের ব্যবস্থাদি আগে থেকে দার্জিলিং-এর টুরিস্ট অফিস থেকে জেনে নেওয়া ভাল। নেহাত অসমসাহসীদের এবং বেপরোয়াদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, তাঁদের যা বারণ করা যাবে তা তাঁরা করবেনই, ঠেকানো যাবেনা। কিন্তু যাঁরা সাবধানী প্রকৃতির তাঁদের জন্য এই তালিকাটা দিলাম। বলা দরকার, এই তালিকা বহু পুরনো। কিভাবে ডাক বাংলোয় আশ্রয় নিতে হয় তা টুরিষ্ট অফিস থেকে জেনে নেওয়া ভাল।

শিঞ্চল	দার্জিলিং	থেকে	৬	মাইল	উচ্চতা	৮,০০০	ফুট
রঙ্গারুন	"	"	"	"	"	৫,৭৫০	"
বাদামটাম	"	"	৭	"	"	২,৫০০	"
মিরিক	"	"	২৫	"	"	৫,৫০০	"
লপচু	"	"	১৪	"	"	৫,৩০০	"

কালিম্পং	দার্জিলিং	থেকে	২৮	মাইল		উচ্চতা	৪,১০০(ক)	ফুট
রিসিস্মুম	কালিম্পং	”	১২	”	(খ)	”	৬,৪১০	”
জোরপোকরি	দার্জিলিং	”	১২	”	(গ)			
টংলু	জোরপোকরি	”	১০	”	(ঘ)	”	১০,০৭৪	”
সান্দাক-ফু	টংলু	”	১৪	”	(ঙ)	”	১১,৯২৯	”
ফালুট	সান্দাক-ফু	”	১২	”	(চ)	”	১১৮১১	”
ডেণ্টাম	ফালুট	”	৪৪	”	(ছ)	”	৪,৫০০	”
পামিওনচি	ডেণ্টাম	থেকে	১১	মাইল		উচ্চতা	৬,৯২০	ফুট
	রিনচিংপং	”	১০	”				
রিনচিংপং	পামিওনচি	”	১০	”		”	৬,৩০০	”
	চাকুং	”	১৩	”				
	ডেণ্টাম	”	১৩	”				
চাকুং	রিনচিংপং	”	১৩	”		”	৫,১০০	”
	দার্জিলিং	”	২০	”				
	(রাম্মাম সেতু হয়ে)							
	বাদামটাম	থেকে	১৩	”				
মেলি	বাদামটাম	”	১১	”		”	৮০০	”
	রংপো	”	১১	”				
	তিস্তা ব্রিজ	”	৩	”				
	কালিম্পং	”	৫	”				
রাংপো	মেলি	”	১১	”		”	১,২৯০	”
সাঁকোখোলা	রংপো	”	৫	”				
বারদাং	কালিম্পং	”	১৮	”				
সোমদাং	সাঁকোখোলা	”	৭	”		”	২,৩০০	”
	গ্যাংটক থেকে শর্টকাটে ৯ মাইল, আর কার্ট রোড দিয়ে ১২ মাইল।							

গ্যাংটক	সোমদাং থেকে ৯ মাইল (শর্টকাট) কার্ট রোডে ১২ মাইল। দার্জিলিং থেকে ৫১ বা ৬৩ মাইল রুট অনুযায়ী।					৫,৮০০	,,
পাকিওং	রংপো	থেকে	৯	মাইল	উচ্চতা	৪৭০০	ফুট
	গ্যাংটক	,,	১১	,,			
	পেডং	,,	১৪	,,			
	রোরাথাং	,,	৬	,,			
কিওজিং	পামিওঞ্চি	,,	১০	,,	,,	৬,০০০	,,
	রিচিংপং	,,	১০	,,			
	লিগল্লিপ	,,	৫	,,			
টোম	কিওজিং	,,	১০	,,	,,	৫,০০০	,,
	নামচি	,,	১১	,,			
	গ্যাংটক	,,	১৫	,,			
নামচি	বাদামটাম	,,	১০	,,	,,	৫,২০০	,,
	চাকুং	,,	১৩	,,			
	আরি	,,	১২	,,	,,	৪,৭০০	,,
	পেডং	,,	৮	,,			
রংলি	সেদনচেন	,,	৯	,,	,,	২,৭০০	,,
	রংপো	,,	১৫	,,			
	পাকিয়ং	,,	৪	,,			
	আরি	,,	৪	,,			
সেদনচেন	আরি	,,	১০	,,	,,	৬,৫০০	,,
	রংলি	,,	৯	,,			

ন্যাটং	সেদনচেন	থেকে	৯	মাইল	উচ্চতা	১২,৩০০	ফুট
কুপুপ	ন্যাটং	„	৪	„	„	১৩,০০০	„
	জেলাপলা চূড়া	„	৩	„			
	পুস্থম	„	৯	„			
পুস্থম (কার্পোন্যাং)	গ্যাংটক	„	১০	„	„	৯,৫০০	„
চাঙ্গু	পুস্থম	„	৯	„	„	১২,৬০০	„
ডিকচু (রিয়াৎদং)	গ্যাংটক	„	১৩	„	„	২,১০০	„
	সিংঘিক	„	১১	„			
সিংঘিক	ডিকচু	„	১১	„	„	৪,৬০০	„
টুং	সিংঘিক	„	৮	„	„	৪,৮০০	„
টুংটাং	টুং	„	৫	„	„	৫,৩৫০	„
লাচেন	টুংটাং	„	১৩	„	„	৮,৮০০	„
থংগু	লাচেন	„	১৩	„	„	১২,৮০০	„
লা চুং	চুং টাং	„	১০	„	„	৮,৫০০০	„
ইয়ামটাং	লাচুং	„	৮	„	„	১১,৭০০	„
পেদং	কালিমপং	„	১২	„	„	৪,৯০০	„
	রিসসিসাম	„	৪	„			
	রেহনক	„	৫	„			
তিস্তা ব্রিজ	দার্জিলিং	„	২৩	„	„	৭১০	„
	পেশক	„	৩	„			
	কালিমপং	„	৬	„			
	বাদামটাম	„	১১	„			
রিয়াং	তিস্তা ব্রিজ	„	৫	„			
	বেরিক	„	৪	„			
কালিঝোরা	বেরিক	„	৫	„			
	শিলিগুড়ি	„	১৬	„			

ডাক বাংলোয় একবার স্থান হলে খাদ্যের অভাব বিশেষ ঘটেনা। চাল ডাল পেঁয়াজ সর্বত্রই পাওয়া যায়—তবে এর জন্য কিছু সময়ের দরকার হতে পারে। সেজন্য সঙ্গে কিছু চিনি, রুটি মাখন, জ্যাম রাখলে ভাল হয়। অর্থাৎ, রান্নার ব্যবস্থা করতে করতে অনেক সময়ে তিন চার ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। ঐ সময়ের জন্য পেট ভরানোর ব্যবস্থা চাই। টিনের মাছ, টিনের সসেজ এসব কিনে রাখলে প্রাথমিক সমস্যাটা মেটে। পাহাড়ী অনেক জায়গাতেই মুরগী এবং তাদের ডিম মেলে। নিরামিষাশীরা অনেক সময়ে অসুবিধেয় পড়েন, সেজন্য তাঁদের আরও সাবধানী হতে হবে। খুঁতখুঁতে কোন লোকের অজানা অচেনা ডাক-বাংলোয় যাওয়া উচিত নয়।

যাঁরা পর্বত-শিখরে, যাকে বলে আরোহণ করবেন, তাঁদের জন্য দরকার হয় বিশেষ ধরণের খাদ্য। ১৯৩৩ সালে হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে যে এভারেস্ট অভিযান হয়েছিল তাতে এক দিনের র‍্যাশন ছিল এই রকম :—

ব্র্যানড'স এসেন্স	—১½ আউন্স
হাইন'স বীনস	—২½ ,,
সারডিন মাছ	—২ ,,
বিস্কুট	—১ ,,
নেসল্ দুধ	—৮ ,,
ওভালটিন	—২ ,,
কাফে আউ লেইৎ	—১ ,,
বার্লি সুগার	—১ ,,
হরলিক'স মল্ট ট্যাবলেট	—১ ,,
ফ্রুট ড্রপস	—১ ,,
কেণ্ডাল মিট	—২ ,,
জ্যাম কিংবা মধু	—৪ ,,
আদা	—১ ,,
মাখন	—১ ,,

এইসঙ্গে পাঠকদের জানাচ্ছি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এভারেস্ট অভিযান যতবারই হয়েছে ততবারই শেষ অংশের যাত্রা শুরু হয়েছে দার্জিলিং থেকে। এখান

থেকেই সংগৃহীত হয়েছে শেরপা, গোছগাছ করা হয়েছে, করা হয়েছে ব্যবস্থাদি। তারপর দার্জিলিং থেকে কালিম্পং হয়ে গ্যাংটক—সেখান থেকে কারপোনাং, চুমবিট্যাং, ইয়াটুং গৌটসা ফারিজং হয়ে কামপা জং। যাঁরা এর পরের খোঁজ খবরও রাখতে চান তাঁদের জন্য আমি হদিশ দিচ্ছি হিউ রাটলেজ-এর লেখা "এভারেস্ট ১৯৩৩"।

আপনারা হাঁটুন বা না হাঁটুন—এই পথগুলি মানচিত্রের গায়ে দেখে রাখুন। নামগুলি পড়তে, উচ্চারণ করতেও মজা লাগবে। মনে হবে কত দূরে কোন্ এক আলাদা জগতের এই সব ছোট ছোট জায়গা! পড়ে যান নামগুলি টুং, লাচেন, রিসসিসাম, কালিম্পং, রংলি···। কল্পনায় দেখতে থাকুন আঁকাবাঁকা রাস্তা—পাকদণ্ডী, পাহাড়ী মানুষ, পাহাড়ী গাছ—কত রকম ফুল, প্রজাপতি, মৌমাছি—কত রকম জীবজন্তু আর বরফ।

বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু পরিচয়ই বা আমরা রাখি?

গাছপালা ! গাছের গায়ের চামড়া !!

গাছপালা না হলে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড় সমস্তই পৃথিবীর গা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গাছপালা, বনজঙ্গল, ঘাস—বাঁশের ঝাড়, অশ্বথ গাছের তলাকার অন্ধকার, আসশেওরার থমথমে ভাব, বেতের ঝাড়, এ সমস্তই জন্তু জানোয়ারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনশো বছর বয়সের গাছ দুদিনে শেষ করে দেওয়া যায়—তার জায়গায় ওঠে ঘরবাড়ি—অথবা ফাঁকাই পড়ে থাকে। মানুষ পৃথিবীর চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে তার দরকারে। কথাটা আমার নয়—একজন বিদেশী বন-বিশেষজ্ঞ বলেছেন—আরও গাছ লাগাতে হবে যদি মানুষকে বাঁচতে হয়। এর নাম রিচার্ড সেণ্ট বার্ব বেকার। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে এখনই কাঠের দুভিক্ষ প্রায় শুরু হয়ে গেছে। এর পর গাছের অভাবে মানুষের অকসিজেন, জল বা খাদ্য কিছুই জুটবে না।

এখন দার্জিলিং-এ গেলে দেখা যাবে গাছ কমে আসছে। প্রচণ্ড শীতে মানুষ আইনী বা বেআইনী ভাবে গাছ কাটছে। রেল ষ্টেশনের কাছে কয়লার ডিপোতে অপেক্ষারত মানুষদের দেখেছি, ছোট ট্রেনে করে কয়লা এসে পৌছুবে তারপর

তাদের রান্না, বা ঘর গরম হবে। ঐ কয়লার দামও মনে হল কলকাতার থেকে দ্বিগুণ দাম। দার্জিলিং বা অন্য সব জায়গাতেই গাছ বাঁচানর একমাত্র উপায় হল ঐ সব অঞ্চলে কয়লা সরবরাহ করা, এবং একটু দাম কমিয়ে, যাতে লোকেরা ঐ কয়লা নিতে উৎসাহী হয়।

কার্সিয়ং থেকে একদা নন্দলাল বসু রবীন্দ্রনাথকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল "পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা।" সেই ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করতে বসলেন, "চেয়ে চেয়ে মনে হল, ঐ একটা দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল-শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তো বড়ো, ঐ দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নবনব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্য লিপি পাঠিয়ে দিলেম।"

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারু রূপে।
সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,—তপস্যার সৃষ্টিশক্তি বলে
সে-বাণী ধরিল শ্যামকায়া, সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রী গান; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অন্তরে।

ঋজুদীর্ঘ দেবদারু—গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হল; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ
ঊর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি ছিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
সূর্যের সঙ্গীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।

উপেন্দ্রকিশোর অবাক হয়ে বলেছেন, "কি উঁচু সব গাছ! জাহাজের

মাস্তলের মতো সোজাসুজি সেই কোথায় উঠে গিয়েছে। ত্রিশ-চল্লিশ হাত অবধি তাদের অনেকের গা একেবারে খালি, শুধু মাথায় খানিকটা ডালপালা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না যে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনোরকম পরিচয় আছে। কিন্তু একটু ভাল করে দেখলে মাঝে মাঝে এক-একটা শিমূল, কদম বা আর কোনো জানা গাছ ধরা পড়ে, তাদেরও সেই রকম হাড়গিলেপনা চেহারা।"

সে সব কতদিন আগেকার কথা। এখনও অনেক গাছ দার্জিলিং-এ রয়েছে। কতরকম চেনা এবং অচেনা গাছ। এই হিমালয়ই হচ্ছে আমাদের আধুনিক গন্ধমাদন। কত রকম ওষুধপত্র তৈরির উপকরণ রয়েছে। কত রকম কাঠ। কতরকম পাতা—কত রকম তার চেহারা। এই জেলাতেই ফুলওলা গাছ রয়েছে চার হাজার রকমের। এরা ১৬০টি পরিবারভুক্ত। এ ছাড়া রয়েছে ৩০০ রকমের ফার্ন। এগুলির মধ্যে রয়েছে আট রকম গেছো ফার্ন। ২০০০—৫০০০ ফুটের মধ্যে পাওয়া যায় সবচেয়ে সাধারণ ফার্ন, এর নাম সিয়াথিয়া স্পিনুলোসা। ফুল হয় না এমন গাছও প্রচুর। প্রচুর সবুজ শ্যাওলা। গ্যামবল নামক এক ইংরেজ উদ্ভিদজ্ঞানী লিখেছেন, পর্বতের মঝোমাঝি অঞ্চলের গাছপালার সঙ্গে ইউরোপীয় গাছপালার সাদৃশ্য খুবই আশ্চর্য করে দেয়। ওক, চেষ্টনাট, চেরি, মেপ্‌ল, বার্চ, অ্যালডার-এই সব ইউরোপীয় গাছ পাওয়া গেছে কালিম্পঙের কাছেকার একটা ছোট জঙ্গলে।

আগে দার্জিলিং ঘিরে ছিল ম্যাগনোলিয়া ক্যামপবেলি। পরে সেগুলোকে কেটে সাফ করা হয়। হিমালয়ের সবচেয়ে বড় গাছ হল হিমালয়ের ফার গাছ। তবে পুরো সাফ এখনও হয়নি। আর আছে বিলিতি ইউ গাছ, সিকিম-স্প্রুস, লার্চ, দু ধরণের জুনিপার। এই অঞ্চলে আসল পাইনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে অবশ্য যে কোনো পাইন-ই আদরনীয় হওয়ার কথা।

দার্জিলিং-এ ফুলের সময় দুটো—একটা হল বর্ষার আগে, অন্যটা বর্ষার পর। বর্ষার সময় বিশেষ কোনো ফুল হয় না। বর্ষার সময় আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে বলে সূর্যের আলোও দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসে পৌছয় না। ফলে অনেক রকম গাছ সে সময় বাড়তে পারে না।

গাছ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বলে মনে হয় এরা কখনই চলেনি। কিন্তু গাছের ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে তারাও চলাচল করত। পশ্চিম এশিয়ার

ন্যাসপাতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়েছে—স্থান করে নিয়েছে দেশে দেশে খাদ্যের টেবিলে। চলে এসেছে হিমালয়ে—কে কবে এনেছে কে জানে? নাকি বুনো অবস্থাতে এটা হিমালয়েই ছিল? আদিতে কিভাবে ন্যাসপাতি গাছ হল? মানুষের জন্মের চেয়েও গাছপালার জন্ম রহস্যময়। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, জন্তু জানোয়ারদের তো খাদ্যের সন্ধানে দিক বিদিক ছুটতে হয়—কিন্তু গাছদের দেখ। তারা এক জায়গাতেই থাকে, কেবল তাদের শেকড় গুলোকে মাটির তলা দিয়ে একটুখানি চালাতে হয়। অবশ্য জীবজন্তুর জগতে যেমন সর্বদা সংগ্রাম চলছে তেমনি সংগ্রাম চলছে উদ্ভিদের মধ্যেও। এমনিতে ততটা যদিও বোঝা যায় না। উদ্ভিদের যুদ্ধে কোনো রকম আওয়াজ নেই। বলা যায় শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ। একটা বড় লতা একটা ছোট গাছকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মারছে—কিন্তু দুজনের কেউই তা নিয়ে প্রকাশ্যে উঃ আঃ করছে না। সব যেন স্লো মোশানের সিনেমায় ছবির মতো ঘটে যাচ্ছে। যে ফুল ধরে খায় সেও কত আস্তে, কত যত্নের সঙ্গে পোকা ধরে!

ন্যাসপাতি গাছের কথা বলছিলাম—এর আরও একটা গুণ আছে, আপেলের রস থেকে যেমন 'সাইডার' মদ তৈরি হয়, এই ন্যাসপাতি বা পেয়ার থেকে তৈরি হয় 'পেরি'। এই ফলের একটা নিয়ম না মানলে ফলটা মাটি হয়ে যায়। এ ফল গাছে পাকাতে নেই। কাঁচা অবস্থায় পেড়ে ঠাণ্ডা জায়গায় আস্তে আস্তে পাকাতে হয়, নইলে কচকচে হয়ে যায়। পেয়ার গাছ থেকে কাঠ কয়লা তৈরি করা যায়—এবং তা অতি উত্তম হয়।

প্লামও পশ্চিম এশিয়ার আদিবাসী। হিমালয়ে এর দেখা মেলে, একটা প্লামের নামই হয়েছে কাশ্মীর প্লাম। প্লাম শুকিয়ে রাখা যায়, আর তার ব্যবসা বেশি ভালই।

পশ্চিম এশিয়ার আর একটা ফল র‍্যাসপবেরি। ইউরোপের অনেক জায়গাতেই এই বুনো ফল ফলে। দার্জিলিং-এ এর দেখা মেলে, বা মিলতে পারে। আর একটা ফল স্ট্রবেরি। এই ফলগুলোকে স্ট্র বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখা হত, তাই তার নামই হয়ে গেছে স্ট্রবেরি। এই ফল নিউ মার্কেটে প্রায়ই দেখা যায়—কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে নয়। বোমবাইতে ১৯৭২ সালে গোটা ত্রিশেক স্ট্রবেরি একটা ছোট ঝুড়ি সমেত কিনেছিলাম আড়াই টাকায়। খেতে বেশ টক টক লাগে—

এর জ্যাম তৈরি হয়। আমাদের দেশে স্ট্রবেরির দাম খুবই বেশি—যে সব দেশে চাষ হয় সে সব দেশে দাম অতি সামান্য। অল্প যত্নেই এই গাছ হয়। দার্জিলিং-এ তার নাম হল রাবাট। এর শেকড় থেকে টনিক তৈরি করা যায়।

আর আছে আখরোট। গ্রীস এবং আফগানিস্তানের আদিবাসী। প্রাচীন কালে রোমানরা আখরোটকে জুপিটারের ফল নাম দিয়েছিল। ল্যাটিন ভাষায় নাম দিয়েছিল Jovis glans, তাই সংক্ষেপিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল Juglans। আমাদের দেশেও ফলের নাম এই ভাবে দেওয়া হয়েছে—যেমন রামফল, সীতাফল ইত্যাদি। অর্থাৎ এই ফল যে অতি উপাদেয় এবং দেবভোগ্য সেটা নামের মধ্যেই প্রকাশ করার প্রবনতা যেমন অন্য দেশেও ছিল তেমনি ছিল আমাদের দেশেও। দার্জিলিংএর ফলের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত আখরোটও নয়, আনারসও নয়, বিখ্যাত হচ্ছে কমলালেবু। দার্জিলিং সহরে আমরা কিন্তু একটিও কমলালেবুর গাছ দেখিনি তার সহজ কারণ হল দার্জিলিং শহরে কমলালেবুর গাছ, আমরা যতদূর জেনেছি, নেই। কিন্তু দার্জিলিং শহরের কাছাকাছি—নিচের দিকে অনেক কমলা ক্ষেত রয়েছে। সে একটা দেখবার মত জিনিস। যাঁরা কমলালেবু ভালবাসেন, তাঁদের একবার শীতকালে এদিকে আসা দরকার। আমরা শীতকালে মিরিক-এ গিয়েছিলাম। এখন মিরিক-কে পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় করার নানা বন্দোবস্ত করা হচ্ছে—পঞ্চতারকা খচিত হোটেল তৈরি হচ্ছে, তৈরি হয়ে গেছে একটা মানুষে গড়া বড় হ্রদ। তাই, এই ছোট গ্রামটিকে আর কেবল কমলালেবু নির্ভর হয়ে থাকতে হবেনা। এর কাছাকাছি চা-এর বাগানও রয়েছে। যাঁরা দার্জিলিংকে মনে করবেন অতি ব্যবসাদার—শহরের যাবতীয় দোষ সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধেছে, তাঁরা একবার মিরিক-এ ঘুরে যান। যদিও যত সহজে বলা গেল তত সহজে এখানে আসা যায়না। যতদূর জেনেছিলাম এখানে দিনে একখানা বাস আসে, আর সেটাই ফিরে যায়। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে বাস বিকেলে রওয়ানা হয়ে সকালবেলা পৌছয়, আর তারপর দিন সকালে শিলিগুড়ি পৌছে দেয়। এতে মিরিক-এ যাঁরা থাকেন তাঁদের নিশ্চয় সুবিধে হয় তাঁরা সকালে শিলিগুড়িতে পৌছে যেতে পারেন, আর সন্ধে বেলা মিরিক-এ, কিন্তু শিলিগুড়ির লোকের পক্ষে সেটা সুবিধের হয় না। অন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকলে অবশ্যই মিরিক-এ রাত্রিবাস করতে হয়। আমরা জানি মিরিক-এও এখন হোটেল

আছে, সেখানে লোকেরা থাকেনও, কিন্তু হোটেল কিরকম, সুখ সাচ্ছন্দই বা কি-রকম তা আমরা সময় না থাকায় খোঁজ নিইনি, কেননা—আমাদের বাহন ছিল একটা জিপ, এবং জিপ যত্র তত্র যায় বলে আমরা আবদার ধরেছিলাম। সে আকাঙ্খা পূরণ করা হয়েছিল, যদিও পথটা জিপ-এর পক্ষেও ছিল ঝুঁকি পূর্ণ!

মিরিক হচ্ছে কমলালেবুর একটা বাজার। শিলিগুড়ির সঙ্গে এর যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। কমলালেবুর সময়ে মিরিকে অনেক লরি যাতায়াত করে—কেউ কেউ দু-এক টাকা দিয়ে ঐ সব লরিতে বাগানে পৌঁছে যেতে পারেন এবং কমলালেবু নিয়ে ফিরে আসতে পারেন। আমরা ১৯৭৭-এর জানুয়ারীতে মাঝারি আকারের একশো লেবু কিনেছিলাম এগারো টাকায়, শিলিগুড়িতে তার দাম তখন কুড়ি টাকা, আর কলকাতায় চল্লিশ।

রাস্তার ধারে ধারে কমলালেবুর ভারে কমলালেবুর ডাল নেমে এসেছে। চলতে চলতে যে কেউ দু-চারটে কমলালেবু তুলে নিতে পারেন,—কিন্তু এখানকার স্থানীয় লোকেরা একটা নিয়ম কঠোর ভাবে পালন করেন—সেটা হল, কেউ অন্যের বাগানের একটা লেবুও বাগানোর চেষ্টা করেননা। সেটা এদের কাছে লিফটের কোণায় থুথু ফেলার মতই অন্যায়। তাই দেখলাম কোনো কোনো গাছের তলায় ডজন ডজন লেবু পড়ে রয়েছে—কিন্তু পথ চলতি কেউই সে কমলালেবু তুলে নেবার চেষ্টাও করছেননা। স্থানীয় একজন ভদ্রলোক বললেন, দুটো কারণে এটা কেউ করেনা—প্রথমত, কাজটা খুবই অন্যায়, দ্বিতীয়ত কমলালেবু এখানে খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। সকলের বাড়িতেই এই গাছ রয়েছে।

কমলালেবুর ফলন শীতকালেই বেশি, কিন্তু তা বলে বছরের অন্যান্য সময় একেবারেই যে হয়না তা নয়। বইতে পড়েছি একই কমলালেবুর গাছে পরিপক্ক কমলালেবুর সঙ্গে সঙ্গে সদ্য ফোটা ফুল, ছোট কমলালেবু এবং বিভিন্ন আকারের কমলালেবু থাকে। অর্থাৎ সব সময়েই কুঁড়ি থেকে সুরু করে কমলালেবুর চরম বিকাশের সবই দেখা যায়। আমরা অতটা দেখিনি, কিংবা দেখলেও খেয়াল করিনি। আমরা এক সঙ্গে অত হাজার হাজার কমলাগাছ এবং লক্ষ লক্ষ কমলা দেখেই মুগ্ধ—ওসব খোঁজ করার কথা তখন মনেই হয়নি। তা ছাড়া, সময়ও খুব একটা ছিল না। কমলা গাছ সম্বন্ধে একটা খবর এখানে দিই সেটা হল গাছ ছ বছর বয়স থেকেই ফল দিতে সুরু করে।

আমরা দেখলাম মেয়েরা এবং পুরুষেরা পিঠে কমলালেবুর ঝুড়ি নিয়ে উঁচুর দিকে চলেছে মিরিক বাজারে। জানতে পারলাম এক হাজার কমলালেবু পৌঁছে দিলে তাদের মেলে সাত টাকা। এক হাজার কমলালেবুর ওজন কিন্তু কম নয়। প্রতিটা কমলালেবু গড়ে একশো গ্রাম ওজন হলেও পুরো ওজন হবে একশো কেজি। একবারে এই বোঝা ঘাড়ে করে বেশ কয়েক মাইল উপরে নিয়ে যেতে অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না, তাই হয়ত এক এক জন দু তিনবার করে কমলালেবু এভাবে উপরে নিয়ে গেলে তবে দিনে আট দশ টাকা জোটে। কেউ এই কাজের জন্য ছোট ঘোড়া ব্যবহার করে। তাতে আয় যেমন বাড়ে তেমন ঘোড়াকে খাওয়াতে পরাতেও খরচ হয়। তবে ঘোড়া তো কেবল কমলালেবু বয়না, মানুষকেও পিঠে নেয়, কাঠ, কয়লা, চা—অর্থাৎ প্রায় গাধার মত তাকেও খাটতে হয়!

পাহাড়ে এলে সব সময়েই এই পরিশ্রমের দৃশ্য দেখতে পাই। কেউ পিঠে কাঠ বয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ নিয়ে চলেছে গরুর খাদ্য, গাছের পাতা, এবং জ্বালানি কাঠ। কোথাও বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙছে রাস্তা মেরামতের কাজে, কনট্রাকটর তাদের লাগিয়েছে—কিন্তু একটি ব্যাপারে তারা আমাদের মত সমতল বাসীদের টেক্কা দিয়েছে—তারা কঠোর পরিশ্রম করছে সম্পূর্ণ সচ্ছন্দ গতিতে, এবং অতি অবিশ্বাস্য হাসি হাসি মুখ করে। ভ্রু কুঞ্চিত না করে। শুনেছি আরও উঁচুতে যারা থাকে তাঁরা অনেক কম পোশাকেই শীতটা কাটিয়ে দেয়—কাঠ কয়লা জ্বেলে সেটা একটা মাটির পাত্রে রেখে পেটের কাছে বেঁধে, তারই উপর পোশাক ঢাকা দিয়ে। তবে কাঠ কয়লা পাওয়াও তো আজকাল আর আগের মত সহজ নয়। এই হাসি হাসি মুখ দেখে তাদের মনে হয় না তারা কোনো হীন কাজ করছে। অবশ্য কোনো কাজই হীন নয়—এই বোধটা এখনও আমাদের ধাতে আসেনি। আসলে ভাল হত।

কমলালেবুর উপকারের কথা নতুন করে বলার দরকার নেই, যে কোনো স্কুলপাঠ্য "স্বাস্থ্য" বইতে তার হদিশ মিলবে। কমলালেবুর রস বোতলে বা টিনে করে বাজারে বিক্রী করার ব্যবসা ভুটানে চালু হয়েছে এবং এখানেও তা চালু হতে পারে। কমলালেবুর খোসা, যা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো সৎকাজে লাগে না তা থেকে চমৎকার মারমালেড হতে পারে। সেভিল জাতীয় কমলালেবুর খোসা একটু তেতো হয়—আর মারমালেড একটু তেতো হলেই ভাল

লাগে। অথচ এই অঞ্চলে মারমালেড-এর কোনো কারখানা আছে বলে আমার জানা নেই। অবশ্য মারমালেড-এর স্বাদ প্রথম দিনেই ভাল লাগবে তা নয়— অনেকেরই তা লাগেনা। বিভূতিভূষণ প্রথম মারমালেড খেয়ে বলেছিলেন, সমস্ত বিশ্ব সংসার তেতো লাগছে! রবীন্দ্রনাথ এই বস্তুটি খুব আগ্রহের সঙ্গে খেতেন। কিন্তু তিনি নিমপাতার রসও গ্লাস ভর্তি করে খেতেন, অতএব এ ব্যাপারে তাঁর কথা কজন মানবেন জানিনা! আজকাল বোতলে ভরা বেশ ভাল জাতের মারমালেড বাজারে পাওয়া যায় · তেতোর ভাগ যেন কম মনে হয়, হয়ত আমাদের জিভে তা আরও ভাল লাগে।

পাহাড়ী জায়গায় আনারসও জন্মে, তবে প্রায় সমতল শিলিগুড়িতে এর ব্যাপক চাষ শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির আশেপাশে যে সব জায়গায় অন্য কোনো চাষ সম্ভব হয়নি, ফেলেই রাখা হত জমি, সে সব জমি "জলের দরে" কিনে নিয়ে অনেকেই আনারস চাষ শুরু করে দিয়েছেন এবং বেশ লাভও হচ্ছে। আমি শিলিগুড়ির ইউকো ব্যাংক থেকে খবর নিয়ে জেনেছি বহু লোককে আনারস চাষের জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এ পর্যন্ত একজনও সে ঋণ শোধ দিতে দেরি করেননি। তবে, আনারস চাষ এ অঞ্চলে যতখানি হতে পারত ততখানি এখনও হয়নি, তার প্রধান কারণ এই অঞ্চলে ভাল ক্যানিং-এর ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়া আনারসের পাতার রসকে কৃমির প্রতিষেধক হিসেবে কাজে লাগানো হত একদা, এখনও কোথাও কোথাও হয় এ ব্যাপার কেউ আগ্রহী হয়ে বোতলে করে বাজারে ছাড়তে পারেন। কেবল কৃমির ওষুধ নয়— আনারসের পাতার রসে আরও কিছু ভাল পদার্থ থাকা সম্ভব। তবে আনারসের পাতা থেকে একরকমের আঁশ পাওয়া যায় ফিলিপিনস-এ এর নাম দেওয়া হয়ে। 'পিনা' সম্ভবত 'পাইন অ্যাপেল' কথাটা থেকেই এটা এসেছে! ফিলিপিনসে এই মোলায়েম অথচ সুদৃঢ় পিনা থেকে লেস জামা এসব হয়ে থাকে। এর জন্য পরিপুষ্ট ভাবের বড় পাতার চাইতে কচিপাতা বেশি ভাল। এসব নিয়ে এ অঞ্চলে কেউই বিশেষ কিছু করছেননা বলেই আমি জানতে পারলাম। তা ছাড়া, আনারসের মদও তৈরি করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও তো পরীক্ষা করে দেখা দরকার। উত্তরবঙ্গের অরণ্য সম্পদ এত রয়েছে, এখানে চাষ আবাদের এত সুযোগ রয়েছে যে দেখে মন খারাপ হয়ে যায় কিছু করা হচ্ছেনা

বলে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে একটা কাগজ কল তৈরির কথা হচ্ছে। এর জন্য দরকার হবে একটা জঙ্গল—জঙ্গল কাটা হবে আর সে জায়গায় নতুন গাছ লাগানো হবে। ত্রিশ বছর ধরে এই ভাবে কাজ চলবে, এবং ত্রিশ বছরে একটা বন পুরো শেষ হতে না হতেই ত্রিশ বছর আগেকার লাগানো গাছ কাটবার সময় হয়ে আসবে। তা যদি হয় তাহলে ব্যাপারটা খারাপ হবেনা। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কাগজ কলমের হিসেব বাস্তব জগতে খাটেনা। সেজন্য একটু সাবধান হতে হবে। নইলে জঙ্গলের ক্ষয়ই বাড়তে থাকবে—সেটাকে আবার পরিপূর্ণ ভাবে গজানো হয়ত হয়ে উঠবেনা।

দার্জিলিং-এর পাহাড়ী অঞ্চলে পাইন গাছ অনেক। তবে পাইনেরও শ্রেণীভেদ রয়েছে। স্ঁচের মতো পাতাওলা এইসব গাছ অনেক বড় হয়—হয়ত দুশো ফুট, কখনো আরও বেশি। আবার ছোট ছোট গাছও হয়—চির সবুজ এই গাছ দীঘায় যেমন ঝাউ গাছ সমুদ্রকে ঠেকানোর কাজে লাগে, তেমনি ফ্রানসের বোর্দোতে এই গাছ সমুদ্রের গ্রাস থেকে জমি রক্ষা করে। কোনো কোনো পাইন ব্যবহার হয় জাহাজের মাস্তুল তৈরিতে। তারপিন তেল তৈরিতেও দরকার হয় এই পাইন গাছ। হিমালয়ের এক ধরণের পাইনের নাম হিমালয়ান পাইন, বা ভুটান-পাইন। এসব গাছ গাছড়ার ব্যাপারে যদি কেউ বিশেষজ্ঞ সঙ্গী হিসেবে থাকেন তাহলে ভ্রমণটা আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষা-মূলক ভ্রমণ কথাটা ব্যবহার করবনা, কেননা শিক্ষা ব্যাপারটার প্রতিই অনেকের রয়েছে জাতক্রোধ, এবং হয়ত খুব অন্যায়ও নয় সেটা।

দার্জিলিং-এর পথে প্রচুর শালগাছ জন্মায় বা জন্মানো হয়। সাধারণ বাড়ি তৈরির কাঠ হিসেবে এবং কম দাম বলে এর নানা রকম ব্যবহার হতে দেখা যায়। আসবাবপত্রের জন্য এই জেলাতে সেগুন গাছও হচ্ছে—আর গুণে তা যদিও বর্মার কাঠের মত অত ভাল হয় না, তবে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে সহজেই পাল্লা দেয়।

গাছ, আরও গাছ
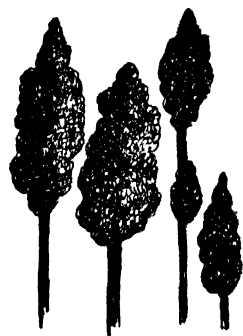
ঁলিং-এ ফুল গাছের পরিবার সংখ্যা একশো ষাটের উপর—এদের প্রজাতির সংখ্যা চার হাজারের কম নয়। এখানে ৩০০ রকমের ফার্ন রয়েছে—আট রকম ফার্ন গাছ জন্মায়। সবচেয়ে যে ফার্ন বেশি চোখে পড়ে তা হল দু হাজার আর পাঁচ হাজার ফুটের মধ্যে—এটা উচ্চতার হিসেব। এর বৈজ্ঞানিক নাম সিয়াথিয়া স্পিমুলোসা। এ হচ্ছে ফুল হওয়া গাছের হিসেব। এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য গাছ যেগুলিতে ফুল হয়না। যেমন লিভারওরটস, (কেমন দেখতে আমার জানা নেই—জেলা গেজেটিয়ার থেকে এই খবর সংগৃহীত)।* আলজি, ফানগি, পাইন এবং আরও কতরকম তার হিসেব নিকেশ হিমালয় অঞ্চলের উদ্ভিদ তাত্ত্বিকেরাই জানেন। সব চেয়ে অদ্ভুত জীবন হচ্ছে লাইকেন-এর। লাইকেন হচ্ছে 'আলজি, এবং ফাংগাসএর বিচিত্র প্রাণ-সমন্বয়। এদের একটাকে ছেড়ে অন্যটা বাঁচতে পারেনা। দুটি বিভিন্ন জাতের জীবন একত্রে থাকার এই উদাহরণ দেখে বৈজ্ঞানিকেরা আশ্চর্য হয়ে যান। ফাংগাস-এর দড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকে আলজি, এই ভাবেই সে জীবনধারণ করে। আর ঐ আলজি ছাড়া ফাংগাস বাঁচতে পারেনা। তবে আলজি কখনও স্বতন্ত্র জীবন ধারণ করতে পারলেও এই বিশেষ জাতের ফাংগাস কদাচ নয়।

. দার্জিলিং-এর পাহাড়ের সঙ্গে গন্ধমাদনের তুলনা নিশ্চয় করা যায়। এর মধ্যে এত বিচিত্র সব গাছপালা রয়েছে যার কাছে কুবের-এর কিংবা রকফেলারের ঐশ্বর্যও তুচ্ছ। যা দরকার তা হল সঠিকভাবে এই গাছ নিয়ে পরীক্ষা করা,

চর্চা করা, গবেষণাগারে সেগুলিকে নিয়ে বারবার নানা ভাবে গবেষণা করা। আমরা সাধারণ লোক—আমাদের কাছে প্রায় সব গাছই এবং প্রায় সব পাখিই নাম না-জানা। আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাবই এর কারণ। তবু, এটা ভাবতে নিশ্চয়ই ভাল লাগে যে বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু একজন ভারতীয়, এবং আরও ভাল—একজন বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও গাছপালাকে তুচ্ছ করেননি। তিনি গাছপালার গুণাগুণ ছাড়াও গাছপালার অনুভূতি সম্পর্কে এমন গবেষণা করেছিলেন যা বৈজ্ঞানিক জগতে ছিল অভূতপূর্ব। তবে তিনি যা কস্মিনকালেও করেননি, বা করবার চেষ্টা করেননি তা হল গাছের প্রাণ আবিষ্কার! অথচ "এই আমাদের বাঙলাদেশ" এর অনেক অজ্ঞ মানুষকে ততোধিক অজ্ঞ কিছু "পাঠ্য" পুস্তক লেখক বহুবার ঐ ভুলই প্রচার করেছেন! তবে এদেশে বাক্ স্বাধীনতা থাকায় তাঁরা নিরাপদেই ঘোরাফেরা করছেন। এই গাছপালার স্বর্গরাজ্য দার্জিলিং-এ রয়েছে কত রকমের অর্কিড। পৃথিবীতে অর্কিডের পরিবার রয়েছে চারশরও উপর, আর প্রজাতি রয়েছে ছ হাজারের বেশি। গাছের উপর যে অর্কিড জন্মায় মানুষের কাছে ঐ জাতের অর্কিডের দামই সবচেয়ে বেশি। অর্কিডের যে চমৎকার ফুল কেবল হয় তা নয়, এ থেকে পাওয়া যায় ভ্যানিলা-গন্ধ, যা আইস-ক্রিম কিংবা নানা রকম বিলাতি মিষ্টান্নে ব্যবহৃত হয়। এর রঙ চকোলেটের মত। ঘুম-এর কাছে তাকদা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে অর্কিডের চাষ হয়। অর্কিড থেকে ওষুধপত্রে ব্যবহার হয় এমন জিনিস হল সালেপ, কিন্তু তা কোন্ ওষুধে লাগে তা আমার জানা নেই। আজকাল আমরা বাজার থেকে যে ভ্যানিলা কিনে আনি, সেগুলির প্রায় সবই অবশ্য নকল ভ্যানিলা।

গ্যামবল নামক এক ভদ্রলোক দার্জিলিং-এর গাছপালা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছেন, দার্জিলিং-এর মাঝামাঝি উঁচুর যে সব গাছপালা রয়েছে সেগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় গাছপালার সাদৃশ্য আশ্চর্য, যদিও প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যে "ইউরোপীয়" গাছগুলি এই সীমানায় দেখা যায় সেগুলি হল "ওক, চেষ্টনাট, চেরি, মেপল, বার্চ, অলডার—আর এই গাছগুলি বড় ও বটে, দেখতেও বড় সুন্দর।"

আর যে সব গাছ এই অঞ্চলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে সেগুলির কয়েকটি হল, লরেল, বাকল্যানডিয়াস, পাইরাস এবং কনিফার। এ ছাড়া—

বলতেই হবে রডোডেনড্রনের কথা। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যে গাছ, তারই নাম রডোডেনড্রন! রবীন্দ্রনাথ এই গাছের আশ্চর্য ফুলকে অমর করে রেখেছেন তাঁর শেষের কবিতা-য়। আমরা অবশ্য সৌন্দর্য মণ্ডিত সব ফুলকে আদর জানিয়েছি—সে ফুল দিশীই হোক বা বিদেশীই হোক। ইংরেজরা যখন এদেশে এসে বসবাস করে গেছেন তাঁরা কিন্তু তখন আমাদের বকুল, শিউলি, টগরকে পাত্তা দেননি। কথাটা সাধারণ ভাবে বলা গেলেও দুএকটি ক্ষেত্রে একেবারে ব্যতিক্রম নেই এমনও নয়। বহুদিন আগে লাইব্রেরিতে ইংরেজ চালিত এক পত্রিকায় কয়েকটা এমন নমুনা পেলাম যেগুলি থেকে প্রমাণিত হয় কোনো কোনো ইংরেজ আমাদের দেশের ফুলকে ভালবাসতে পেরেছিলেন। একটা নমুনা এখানে দিলাম, প্রাসঙ্গিক হল কিনা কে জানে? তবে আমার এই বিশ্বাস, আমার পাঠকেরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন আমি দার্জিলিং নিয়ে শুধু গাইড বই লিখছিনা, লিখছি দার্জিলিং নিয়ে আড্ডা জমানোর বই!

তুলসী সম্পর্কে একজন ইংরেজ লিখছেন:

Pretty Tulsi! aromatic
Strangely so to me thou art,
Although I be deemed fanatic
Still I clasp thee to my heart:

তিনি তুলসীকে দেখেছেন—তাঁর দেশের 'লেমনবাম' এর অনুরূপ ফুল গাছ রূপে। তিনি লিখছেন:—

For so like a much loved flower
Of my far New England home,
Art thou, blessing my love lower,
Fancy tells a friend has come!

কেবল তুলসী নয়, এই কবি বেলা, গন্ধরাজ—এমনকি পুদিনা নিয়েও লিখেছেন। সেটা আর এখানে উল্লেখ নাই করলাম, কেননা ইতিমধ্যেই হয়ত গল্পে গল্পে দার্জিলিং-এর সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিং সম্পর্কে একটি কথা এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার—এখানে গাছ ফুল লতা পাতার সাম্রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার মানা নেই। এজন্য প্রকৃতি প্রেমিককে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। এই অঞ্চলে বিপজ্জনক এবং নানাবিধ বুনো প্রাণীর সাক্ষাৎ আগে প্রচুরই পাওয়া যেত, বর্তমানে অবশ্য তাদের সংখ্যা কম, কিন্তু তবু আছে—এবং এখনও সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু জন্তু জানোয়ারদের সম্পর্কে কিছু বলার আগে দার্জিলিং এর সবচেয়ে দুটি বিখ্যাত চাষ করা গাছের কথা বলা যাক। তাদের একটি হল নেশা, অন্যটি হল ওষুধ। সংক্ষেপে, চা ও সিনকোনা। প্রথমটির পাতা, অন্যটির ছাল।

গাছের পাতা, গাছের ছাল

ততখানি আধুনিক নন্ এমন এক কবি মংপুতে গিয়ে ভিজিটরস' বুক-এ একটি কবিতা লিখেছিলেন—বেশ কয়েক বছর আগে। কবিতাটি এখানে পুরো তুলে দিচ্ছি, এর কারণ কিন্তু কেবল সিনকোনা নয়, এর প্রধান কারণ মংপু এবং রবীন্দ্রনাথ। মংপু দার্জিলিং জেলারই মধ্যে, এটাও পাহাড়ী জায়গা, এখানকার দৃশ্যও অপরূপ—আর এই মংপুতেই মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন চার বার। এটি আমাদের এখনও তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি, কেবল তিক্তক্ষেত্রই রয়ে গেছে, তার প্রধান কারণ এখানে বাইরের লোকেদের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত

নেই, এখানে গিয়ে থাকবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। বন্ধুবর, ভ্রমণপাগল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছে ও মংপুর গেস্টহাউসে ছিল। শক্তির একটা সুবিধে ওর সর্বত্র অবারিত দ্বার। তার কোনো অসুবিধেই হয়না কোথাও—যা অসুবিধে তা অন্য লোকেরাই সহ্য করে এবং হাসিমুখে। যাই হোক আগে 'ভিজিটরস' বুক-এর কবিতাটির উদ্ধৃতি দিই :—

দিগন্তে ছাইরঙ ঢালা
ঊর্ধ্বে রেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার
এখানে বৈশাখ-শেষে
দেখা হল তোমার আমার

এই রক্তকরবীর গুচ্ছ, আর
ওই জুঁই চাঁপা
এরি মধ্যে তোমার স্বাক্ষর
রঙে রঙে চাঁপা।

তিক্ত সিঙ্কোনার ডালে
রক্তিমাভ পাতা,
লেবুগন্ধী ঘাষ আর আঙুর-স্তবক
একসূত্রে গাঁথা।

ফুলের উৎসব রাতে
বেগুনি-রং জাকারান্দা-শাখা
চপল বৃষ্টিতে ধোয় ঝরে-পড়া ফুল
সেই রঙে মাখা।

মংপুর আকাশে বনে
পাহাড়েও পাহাড় প্রান্তরে

একটি তুলির রং—আশ্চর্য তুলির
শুধু খেলা করে।

বৃষ্টিতে ধোয়না রং
হাওয়ায় মোছেনা,
মৃত্যুর ঝড়েও জানি
এ রং ঘোচে না।

মংপুতে বৈশাখী জলে
আঁকা এক জলরঙা ছবি
তার মধ্যে তুলি হাতে তুমি
বসে আছো কবি।

এই কবিতাটির হদিস কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী আমাকে দিয়েছেন। তিনি কয়েক বছর আগে এটি লিখেছিলেন—এর সঙ্গে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ ওখানে (যেখানে ভিজিটরস' বুক রয়েছে) বসে ছবি আঁকতেন। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকেই এই কবিতায় বিশেষ করে ধরবার চেষ্টা করেছি।" মংপু সম্পর্কে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁরা জানতে আগ্রহী তাঁদের অবশ্য অসাধারণ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'-এর দ্বারস্থ হতেই হবে। জগন্নাথ চক্রবর্তীর এই কবিতাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে তিনি এতে সিনকোনার উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয় আর কোনো কবিতায় এর উল্লেখ নেই! আর মংপু যে দৃশ্যের দিক থেকে কত সুন্দর তার পরিচয় অবশ্য সঠিকভাবে জানতে হলে ওখানে কোনমতে পৌছুতেই হবে। এর বিকল্প নেই। আমি যতদূর জানি শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং-এ খোঁজ করলে ভাড়া করা জিপ-ট্যাকসি বা গাড়ি মিলে যেতে পারে। কত টাকা খরচ হয় বা অন্যান্য বৃত্তান্ত আমার জানা নেই। আরও একটা উপায় হল ঐ পথে চলছে এমন ট্রাকওলার সঙ্গে ব্যবস্থা করে যাওয়া। এতে দু তিন টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। মংপুতে একটা মধ্যবিত্তদের জন্য এবং সাধারণ লোকের জন্য হোটেল যদি সরকার খোলার ব্যবস্থা করেন তাহলে এই তিক্ত-ক্ষেত্রটি সত্যি সত্যি তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

সিনকোনার ইতিহাস আমাদের দেশে বেশি দিনের নয়। রবীন্দ্রনাথ যে বছর জন্মেছিলেন তার এক বছর পর, ১৮৬২ সালে এই অপূর্ব গাছটির আমদানি করা হয় পেরু থেকে। এই "পেরুর ছাল"এর জ্বর তাড়ুয়া গুণের পরিচয় প্রাচীন 'ইনকা'দের জানা ছিল। আসল ঘটনাটা এই যে এই গাছের ছালের গুণ আবহমানকাল থেকে পেরুর মানুষ জানে। যেখান থেকে জেসুইট পাদরিরা আমদানি করে ইউরোপে, তাই ইউরোপে এর নামই হয়ে যায় জেসুইটের ছাল। ছালটা অবশ্য সিনকোনার, কিন্তু মানুষ সংক্ষেপ করবার খাতিরে অনেকরকম অর্থহীন কথা চালু করে আমাদের শব্দ ভাণ্ডারকে ফাঁপিয়ে দিয়েছে, নতুনত্বও এনেছে। আসলে সিনকোনা নামটাও ঐ তিক্ত গাছটির আসল নাম নয়। ১৬৩৮ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে পেরুর স্পেনদেশীয় ভাইসরয়ের স্ত্রীর জ্বর এই গাছের ছালের সাহায্যে ছেড়ে যায়—আর তার পর থেকে এই গাছের গুণের কথা ইউরোপবাসীরা জানতে শুরু করে। তখন ঐ ভাইসরয়ের স্ত্রীর নাম, কাউনটেস সিনকন থেকে গাছের নামই হয়ে যায় সিনকোনা। সিনকোনার গুণ বহু শতাব্দী ধরে মানুষ জানলেও, ভারতবর্ষে এর চাষ করার চেষ্টা হয় প্রথমে ১৮১৯ সালে। ডাঃ এইনসলে নামক এক ভদ্রলোক বলেন, এর চাষ ভারতবর্ষে করতেই হবে, কিন্তু আমাদের দেশে যা হয় আর কি, বলা আর করার মধ্যে থেকে যায় বিস্তর ফারাক। আবার একজন, এবারে ডাঃ রয়েল ১৮৩১ সালে বললেন, সিনকোনার চাস দরকার এদেশে। বাস, ঐ পর্যন্তই। সময় চলতে লাগল, আর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে এদেশের মানুষ কঙ্কালসার হতে লাগল, পালে পালে মরতেও লাগল। এল ১৮৫৭ সাল—ভারতের রাজনীতির গগণে এবং জনজীবনে সেবার এল দুটো ঘটনা। একটা হল সেপাইদের উত্থান, আর অন্যটি হল ভারতসচিব, সার ক্লিমেনস মারকামের উপর দিলেন এই গাছ সরবরাহের ভার। এদিকে বাংলা সরকারও আলাদা করে এই একই কাজের ভার দিলেন কলকাতার রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের সুপারিনটেনডেনট ডাঃ টি অ্যানডারসনের উপর। ইতিমধ্যে ১৮৫৪ সালেই জাভায় এই গাছের চাষ শুরু হয়ে গেছে। গাছের চারা এল জাভা থেকে নীলগিরি পাহাড়ে। এই গাছের চাষ শুরু হয়ে গেল ১৮৬১ সাল থেকে। এর পরের বছর—অর্থাৎ, ১৮৬২ সালে সিকিমএর ডিমসং-এ এবং দার্জিলিং-এর সিঙ্কলে এর চাষের চেষ্টা করা হল। ডিমসংএ গাছ হল, কিন্তু সিঙ্কলে সিনকোনা

বাড়ল না। ১৮৬৩ সালে এর জন্য জায়গা স্থির হল মংপুতে। চাষ বাড়াতে বাড়াতে মংপুতে ১৮৯০ সালেই ৪৫ লক্ষ সিনকোনা গাছের চারা লাগানো হল। গাছগুলো লম্বায় হল ৩০ ফুট পর্যন্ত। তবে এতঁতেও কিন্তু ভারত নামক জ্বরের দেশের কুইনিন-এর অভাব মিটল না। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জাভা থেকে এর আমদানি করতে হয়েছিল। করতে হয়েছিল তার পরও।

১৮৯৭এর আগে কিন্তু ম্যালেরিয়া কি, কেন হয় এসব কেউ জানত না। ঐ বছরের ২০ আগসট সার রনাল্ড রস সেকান্দারবাদে প্রথম সন্ধান পান এনোফিলিস মশার পরাশ্রয়ী ম্যালেরিয়া জীবাণু। সার রনাল্ড সে জন্য সমস্ত দুনিয়ার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। পরে ঐ ম্যালেরিয়ার দৌলতে সিনকোনার চাষ খুবই লাভজনক হতে থাকে। পরে কিছুদিন ম্যালেরিয়া না থাকায় মন্দা চলছিল, কিন্তু এখন আবার ম্যালেরিয়া মাথা ছাড়া দিচ্ছে।

যাই হক, মংপুতে গেলে পর্যটকরা দেখতে পাবেন সিনকোনা গাছের চাষ, আর চমৎকার দৃশ্য। অফিসারদের বাংলো আর সবুজ। জায়গাটা দার্জিলিং-এর মত অতটা উঁচুতে নয় বলে ঠাণ্ডা খুব বেশি নয়, আবার শিলিগুড়ির মত নিচে নয় বলে গরমও বেশি নয়।

দার্জিলিং জেলাটি নানা দিক দিয়ে আমাদের মন ভোলায়। এর চা, এর সিনকোনা, এর কমলালেবু, এর অপূর্ব নদী, এর চমৎকার সব হাসি মুখ-কঠোর পরিশ্রমী অধিবাসী। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই দার্জিলিং এ এসে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন কার্সিয়ং থেকে (২১ অকটোবর ১৯১৫) "পাহাড়ে শারীরিক উদ্যম খুব বাড়ে—হৃদয়ে একটা বিমল শান্তি পাওয়া যায়"—

In the peaceful solitude of the hills, life can dreamt awal—the misty veil hanging about the hills is but the dreamy veil of fair poetry.

তিনি আরও লিখছেন :—পোপ না কে যেন বলেছিল—

Thus let live unseen unknown etc. etc Thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone fell where I lie.

কথাগুলির spirit পাহাড়ে এলে বেশ বোঝা যায়।

কার্সিয়ং এর পাহাড় মুগ্ধ করেছিল তরুণ সুভাষকে। তবে ঐ আনন্দের মধ্যেও

তিনি কলকাতার "উন্মত্ত, অবিরাম উদ্যম ও চেষ্টা—যেটা কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায়—যেটা প্রস্বস্থ থাকে।" এই ব্যাপারটি নেই সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। শান্ত, কাজ নেই—এমন কথা সুভাষের অভিধানে লেখে না। তবে তিনিও বলেছেন···এখানে এসে একটু Lotus-eater হওয়া যায়—Why should life all labour be ?

কার্সিয়ং এর পর দার্জিলিং। ঐ বছরেই ২০ নভেম্বর তিনি দার্জিলিংএর ক্রেইজা মাউন্ট থেকে লিখছেন—এক হিসাবে কার্সিয়াং-এর চেয়ে এ স্থানটি ভাল। খাবার দাবার ভাল পাওয়া যায়—এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর পাওয়া যায়। তা ছাড়া দেখিবার কয়েকটি জিনিস আছে। ···মাউন্ট সিঞ্চল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ত দেখাই যায় তা ছাড়া এভারেস্টও দেখিলাম।···

দার্জিলিং সম্পর্কে তরুণ সুভাষ লিখলেন—Calcutta transferred to the hills—এই যা দোষ। এখন লোকেরা নেমে গেছে তাই বেশ লাগছে।

দার্জিলিং ছিল বালক সুভাষের স্বপ্ন! তিনি পরে লিখেছেন:—তখন boyish emotionএর বশবর্তী হইয়া বলিয়াছিলাম—জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে যেদিন independent হইব—এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জিলিং যাইব।

তারপর লিখিছেন—

কিন্তু জীবন আমার enjoymentএর জন্য নহে।

···my life is a mission, a duty.

···এ পাহাড় ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। অবশ্য বঙ্গদেশের অন্যান্য আকর্ষণ আছে—কিন্তু তা ছাড়া এ 'পাহাড়ী জঙ্গলী' দেশ অতুলনীয়। বাস্তবিক হিমাচল প্রদেশ দেবতার বাসস্থান—স্বর্গ।—ইত্যাদি।

বুনো জীবজন্তু এখনও দেখা যায়

দার্জিলিং যাবার পথে বাঘ ছিল। এখন প্রায় নেই। চিতা ছিল—এখন দু চারটে পাওয়াও যেতে পারে। বাইসন ছিল, এখনও দু পাঁচটা রয়েছে। কিন্তু তাদের হঠাৎ হঠাৎ অকাল মৃত্যু প্রকৃতি বিদেরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। এখানে তরাই-এর মধ্যে ছিল প্রচুর হাতি, যারা এখন আশ্রয় নিয়েছে কিছু দুর্ভেদ্য ভুটান পাহাড়ী অঞ্চলে। তরাইতেও কিছু রয়েছে। মাঝে মাঝেই তারা হঠাৎ লোকালয়ে উপস্থিত হয়ে আতঙ্ক সঞ্চার করে। আবার এটাও বলা যায় হাতিরা যে সব জায়গায় থাকত সে সব জায়গায় মানুষ ঘর বাড়ি বানিয়ে ফেলায় হাতিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। মোট কথা—মানুষের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিগত একটা ভারসাম্য অনেকদিন আগেই প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর পরিচয় মিলবে প্রকৃতি থেকে নানা জিনিসের অন্তর্ধানের ঘটনায়। এক কালে বাঘেদের দেখা যেত দশ হাজার ফুট উঁচুতেও। টাইগার হিল নামটাও মনে পড়িয়ে দেয় বাঘেরই কথা। এখন তাদের সমতল ক্ষেত্রেই প্রায় দেখা যায় না! চিতাদেরও এককালে রাজত্ব ছিল এখন তারা তাড়া খেয়ে খেয়ে কটাই বা রয়েছে! অনুমান করা হয় ডোরা কাটা বাঘের সংখ্যা এই শতাব্দীর গোড়াতে ছিল চল্লিশ হাজারের বেশি, এখন অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও এই সংখ্যা হাজার আড়াই এর বেশি করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। এটা বলা দরকার যে সর্বত্র বাঘ থাকা খুব সুখের ব্যাপার নয়। মাঝে মাঝে মানুষখেকো বাঘেরা যে কি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে তার কথা জিম করবেট-এর বর্ণনায় আমরা স্পষ্ট ভাবে পেয়েছি। কিন্তু যেমন ঝোপে ঝোপে বাঘ থাকা ঘোরতর বিপদের কথা, তেমনি কোনো ঝোপেই বাঘ থাকবেনা, সেটাও অতি নিষ্ঠুর একটা ঘটনা। বাঘ চায় জঙ্গল, মানুষ সেই জঙ্গল কুড়ুলের আঘাতে আঘাতে কমিয়ে আনে, শেষ করে দেয়। বাঘ চায় হরিণ, কিংবা অন্য কিছুর মাংস—মানুষেরও তাই চাই।

অতএব শিকারীদের লক্ষ্যভেদের আনন্দ যত বাড়তে থাকে তত হরিণ, নীলগাইদের সংখ্যা কমতে থাকে। বাঘেদেরও খাদ্য কমতে থাকে। বাঘ যখন লোকালয়ে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, এবং মানুষও তখন বাঘকে মারতে বাধ্য হয়। এই ভাবেই খেলা চলেছে—মানুষের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বাঘের নিষ্ঠুরতার কোনো তুলনাই চলেনা। জঙ্গল কমছে—জঙ্গলের জীবজন্তু কমছে, বাঘ কমছে। মানুষ "উন্নত" হচ্ছে। এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। এবং এরই মধ্যে খবর পাই—জলপাইগুড়িতে একদল লোক একটা বাঘ মেরে তার মাংস খেয়েছে। মাংস খাওয়ায় জন্যই বাঘকে তারা মেরেছে! এটাও খুব বেশিদিনের ঘটনাও নয়।

আবার আরও বুনো জীবজন্তুর মৃত্যুসংবাদ পাই। বাইসন—একটা নয়, তিন তিনটে বাইসনের মৃতদেহ দার্জিলিংএ পাওয়া যায়। বনবিভাগ হতচকিত, কিন্তু অভিজ্ঞ মহল জানেন সব মৃত্যুই "স্বাভাবিক" নয়, বা দুর্ঘটনাও নয়। তার প্রমাণ মেলে এই খাস কলকাতায় বসেই। এখানেই রয়েছে বাঘের চামড়ার বিরাট 'মারকেট'। কলকাতা শহরে কেবল যে বাঘের দুধ মেলে তাই নয়, পয়সা দিলে বাঘের চামড়া, নখ, দাঁত এসবও পাওয়া যায় এবং এক একটি বিষয়ের দক্ষিণাও নেহাত মন্দ নয়। এতসব কারবার চলে অথচ কেউ তা জানেনা—রহস্যটা সেখানেই।

বুনো জীবজন্তু এখনও দেখা যায়। এই অঞ্চলে হাতিদের স্বভাব এখনও চমৎকার। তারা এখনও জঙ্গলেই থাকে এবং মানুষের উপর তাদের অত্যাচার নেহাতই কালে-ভদ্রে। জঙ্গলে-জঙ্গলেই তারা থাকে। কখনো ভারতে, কখনো ভুটানে। এব্যাপারে তাদের কোনো বাদ-বিচার নেই। আনন্দবাজারের সংবাদদাতা এ হাতীদের সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। হাতিরা নাকি দল বেঁধে অনেক সময় মানুষ-পল্লী আক্রমণ করে এবং হাঁক ডাক করে জানিয়ে দেয় তাদের একটা বিশেষ জিনিস চাই—আর তা হল "হাঁড়িয়া"। তাদের যদি চটপট হাঁড়িয়া যোগান দেওয়া যায় তাহলে তারা আর ঘরবাড়ি ভাঙে না। চমৎকার। হাতিরা দলবদ্ধ থাকে, তাদের গায়ে জোর বেশি, তাদের জন্য এখনও কিছু জঙ্গল অবশিষ্ট রয়েছে তাই তারা টিকে গেছে। নইলে কি আর তাদের আস্ত রাখা হত? গণ্ডারের সংখ্যা যে হারে কমে এসেছে হাতির সংখ্যাও সেই রকমই কমে যেত। তবু হাতির সংখ্যা কমছে। কমছে সহজ নিয়মে।

জঙ্গল কমছে তাই হাতিও কমছে। জঙ্গলকে রক্ষা করলেই হাতি বাঘ হরিণ এসবই থাকবে। দার্জিলিংএর জঙ্গলে একদা কম বুনো প্রাণী ছিলনা। সরকারী হিসেবেই তার পরিচয় মেলে। পাহাড়ী জায়গায় একদা যে সব প্রাণী ছিল তারা হল সম্বর, কাকর হরিণ, গোরাল, সিরু, মনাল এবং অন্যান্য কুক্কুটজাতীয় পাখি। কালো ভালুক এবং সাদা রঙের চিতাবাঘ ছিল।

দার্জিলিং-এর সমতল ক্ষেত্রে বা প্রায় সমতল ক্ষেত্রে ছিল হাতি, গৌর, সম্বর, চিতল, পারা ও কাকর হরিণ, বুনো শুয়োর, বাঘ, চিতাবাঘ, বনবিড়াল, গন্ধগোকুল সজারু, খরগোশ, বুনো মোরগ, ময়ূর, কালিজ, কালো তিতির আর মন্থর ভালুক। এ সমস্তই স্মৃতিকথা। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত সরকারী কেতাব বাঙলার শিকার প্রাণী থেকে এই হিসেব নেওয়া হয়েছে। বইটি চমৎকার হয়েছিল, লেখক ছিলেন শচীন্দ্রনাথ মিত্র। তবে সরকারী হিসাব যেমন হয়ে থাকে এও তেমনি। সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা সরকারী কাগজ কলমের ফর্ম অনুযায়ী এসব হিসেব। একটা উদাহরণ দিই—এই বইএর হিসেব অনুযায়ী ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮৮:টি জলমুবগী মারা হয়েছিল। এখন জলমুরগী কে কোথায় কটা মারল তার হিসেব সরকারের পক্ষে জানা সঠিক ভাবে একরকম অসম্ভব! বাঘ, হরিণ, হাতি পর্যন্ত লোপাট হয়ে যায় সরকারী খাতায় তার চিহ্ন থাকেনা এমনও হয়, আর জলমুরগী! আবার দেখা যাক বাঁদরের হিসেব। ১৯৫১-৫২ সালে ২৮টি বাঁদর মারা পড়েছিল, ১৯৫২-৫৩ সালে ৭২টি। এর আগে একটিও বাঁদর মারা পড়েনি বলে সরকারী হিসেবে জানা যাচ্ছে।

যাক সে সব কথা। এবারে আধুনিক এক কবি-বন্ধু সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর লেখা একটি কবিতা উপহার দিই। দার্জিলিং নিয়ে লেখা এই কবিতাটি আশা করি মধুরেণ সমাপয়েৎ হিসেবে ভাল লাগবে।

প্রিয় পাহাড়ের বর্ণনা

এ খেলা কেমন! গ্রাহ্য দৃশ্যগুলি সব
কুয়াসার ছটফটে সাদায় দ্রুত বদলে যায়,

পাহাড়ের নিসর্গ কাঞ্চন রেখা ঢেকে ফ্যালে
নাবালক দুষ্টু মেঘ।

সারাদিন মানুষের চোখ
ভাখে ঐ স্বেচ্ছাশিল্প, অস্থির, যেন বা
সূর্যও যা কিছু প্রাচীন আর মধ্যচিত্ত
সব ফেলে রেখে এসেছে দূরের সমতলে।
এখন এখানে এই পর্বতের সবুজ আগ্রহে
অকবিও বিচলিত হয়, তার পুরুষ দুহাতে
স্পষ্ট রাখার মতো নয় উজ্জ্বতা
—হায় সে কি শুধু উলের দস্তানা?
শীত, এই আকাশ—আক্রান্ত শরীর আজ শীতে পরাজিত
সে শুধু ঘুমুতে চায়,
সমতল বহুদীর্ঘ দিন তাকে জাগিয়ে রেখেছে;
সবুজ আর সাদা ছাড়া তার আজ আর কোনো সঙ্গী নেই,
সবুজ রয়েছে থেমে যেন বিবাহিত বিশ্বস্ত প্রেমিকা,
সাদা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কোনো রঙের বক্তব্য নেই
সুখ দুঃখের ট্রেন টিকিট নেই,
এই দৃশ্য ভাঙাগড়ার খেলায় যেন সে প্রায় ভুলেই গিয়েছে
আবার ফিরতে হবে ধুলো আর ধোঁয়ার পরম নগরীতে,
দার্জিলিং থেকে দ্যাখা হিমালয় ঢুকে যাবে
নিরুত্তর মানচিত্রে—যা নাকি কলকাতা।

শুধু কোনো শীতের গভীর অবেলায়
শুষ্ক ঠাণ্ডা' হাওয়া এনে মনে পড়বে—এ বাতাস
উত্তরের পর্বতদেবতা তার নিজস্ব কবিকে পাঠিয়েছে
যাতে সে তার বয়স্ক নিঃশ্বাসেও পায় কিছু পংক্তির মত্ততা
আর সে উষ্ণতা খোঁজে তুলো ও কম্বলে নয়

খোঁজে নিজের শ্রীযুক্ত রক্তে, যার ধমনীর ছিন্নপথে
অনেক গ্রন্থের কালি, অনেক নিরুক্ত শব্দ
ঢুকে গিকে কোনদিন বেরুতে পারেনি।

এবার দার্জিলিং-এর অভিজ্ঞতা নিতে হলে বেরিয়ে পড়তে হবে উত্তরের পথে সঙ্গে থাকবে মনের মত কোনো এক সঙ্গী। বা একা।

পরিশিষ্ট

·· ছিলেম দার্জিলিঙে,
সদর রাস্তার নিচে এক প্রচ্ছন্ন বাসায়।
সঙ্গীদের উৎসাহ হল
রাত কাটাবে সিঞ্চল পাহাড়ে।
ভরসা ছিলনা সন্ন্যাসী গিরিরাজের নির্জন সভার 'পরে,—
কুলির পিঠের উপরে চাপিয়েছি নিজেদের সম্বল থেকেই
অবকাশ সম্ভোগের উপকরণ।
সঙ্গে ছিল একখানা এসরাজ, ছিল ভোজ্যের পেটিকা,
ছিল হো হো করবার অদম্য উৎসাহী যুবক,
টাটুর পিঠে চড়ে ছিল আনাড়ি নাড়ুগোপাল,
তাকে বিপদে ফেলবার জন্য ছিল ছেলেদের কৌতুক।
সমস্ত আঁকা বাঁকা পথে
বেঁকে বেঁকে ধ্বনিত হল অট্টহাস্য।   **—রবীন্দ্রনাথ** (পত্রপুট)

There are no mountain ranges anywhere in the world which have contributed so much to shape the life of a country as the Himalayas have in respect of India.

—**K M. Panikkar**
(Geopolitical Factors in Indian History)

THE DOG SHOW

Dear Friends, we wish to interest
And let all people know
That in the Poojahs will be held
The first Darjeeling show

As we parade the street and Mall
We note with pitying eyes
A lot of really first class dogs
All yearning for a prize ......

The Darjeeling Times—1912

দার্জিলিং-এর কবরখানায়

1842— Alex. Cosma Koorosi, "a native of Hungary, who, to follow out philological researches, resorted to the east, and for years passed under privation, such as seldom has been endured and patient labour in the cause of science, compiled a Dictionary of the Tibetan languags his lasting and real monument. On his road to H'lassa to resume his labours, he died at Darjeeling on the 11th of April, 1842, Aged 44 years."

…মনে পড়লো আরও অনেক জায়গায় অমন জমি নেব বলেছিলাম। তখন সৌন্দর্য দেখে ভুলে যাই যে অত জায়গায় বাড়ি করবার মত পয়সা নেই আমার হাতে। সেবার দার্জিলিঙ গিয়ে ভাবলাম ঘুমে একটা বাড়ি না করলে জীবনে ঘুম নেই! কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করে জানা গেল অন্তত ছয় হাজার টাকার কমে ঘুম শহরে বাড়ি হবার জো নেই—তখনই শতহস্তেন বাজিনাম্। —**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (বনে-পাহাড়ে)

…দার্জিলিঙের আসল শোভা ঘর-বাড়িতে নয়, সে হচ্ছে
মেঘের আর হিমালয়ের আর আলো আর ছায়ার শোভা।

—**উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী**

অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রির মহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়। ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট—আর্যাবর্তের সমতলভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, Alpine medows, ভারতের প্রকৃত রূপই এই—এই রাঙামাটি, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারিনে।…

—**বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**, (তৃণাঙ্কুর)

আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম। · হিমালয়ের মহান সৌন্দর্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও দু-চার খানা সঙ্গে আনিতেছি।···

রবীন্দ্রনাথের কাছে ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের চিঠি
(১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

From Karsiang to Darjeeling the gniess is continuous, verging in some places towards mica-schist.

Memoirs, Geological Survey of India 1875

শোনা যায় একজন সাহেব পাহাড়ী মুটের ঝাঁকায় চড়ে প্রথমে দার্জিলিং এসেছিলেন। সে অবশ্যি অনেক দিনের কথা, তখন পাহাড়ে উঠবার কোনো রকমের পথই ছিলনা। **—উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী**

Darjeeling in 1835 was but a collection of about 20 huts with a population of 100 souls. In 1840 the town consisted of the Kutchery (located in the building now in occupation by the Gymkhana club) and about 30 other buildings of the meanest description. **—Darjeeling Past and Present**

Sir Ashley Eden (Lt Governor General of Bengal) with his usual practical common sense recognized the fact that if a light railway could be constructed to Darjeeling, it would definitely develop that town, also the country through which it passed. —Newman's Guide to Darjeeling—1922

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূণ্যে আর রসাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে
বনেরে করায় সাজ শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছ মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,…

রবীন্দ্রনাথ (জন্মদিনে) ১৯৩৯—মংপু

মহাদেবের তৃতীয় নেত্র উদ্ভবের আর একটি কারণ উল্লিখিত আছে। পার্বতী একবার পরিহাসচ্ছলে মহাদেবের দুই নেত্র হস্তদ্বারা আবৃত করেন। এতে সমস্ত জগত অন্ধকারে আবৃত হয়ে যায় এবং আলোক বিহীন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন পৃথিবীর লোকদের রক্ষা করবার জন্যে তিনি তাঁর ললাটে তৃতীয় নেত্র উদ্ভব করেন। এই নেত্রের তীব্র জ্যোতিতে হিমালয় দগ্ধ হয়ে যায়; পরে পার্বতীর প্রীতির জন্য তিনি হিমালয়কে আবার পূর্বের ন্যায় রমনীয় করেন। —**পৌরাণিক অভিধান**

উষা আসে অচল শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।

উষা হাসে অচল—শিয়রে,

ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বসো সখী মনের শিয়রে
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

প্রমথ চৌধুরী (তেপাটি) কার্সিয়াং—১৯১৪

The derivation of the name Darjeeling is variously given, but the generally accepted one is that it is a compound of the Tibetan word "**dorje**" and "**ling**"—the first meaning the thunderbolt—originally the scepter of India, and the second, a place. Hence "the place of the thunderbolt". This was the name by which the Buddhist Monastery once located on the top of observatory hill was known.

Newman's Guide to Darjeeling

The Bazar

Tibetan brassware and curios, prayer wheels, tiger skins, rugs, furs, jewellery, turquoise ware, Indian, Chinese and Japanese silver goods, shawls, kukris, woollen goods of local manufacture, carvings, side by side with groceries, patent medicines, lamps, iron mongery, etc , all go to comprise the most heterogenous collection of articles exhibited in any bazar in the world.

Newman's Guide to Darjeeling—1922

...its cosmopolitan bazar, where villagers come from afar each Sunday, some to barter and some to buy, and where John Chinaman has a rag and bottle shop ; its variety of races—the Nepalese, the Bhutanese, the Tibetan, and the Lepcha, amidst whom are now entwined the Hindu, the Mussulman, the Parsee and the white man ; its commanding views of the majestic ; silent snows ;—is a holiday resort that is well-known almost the whole world over.

—R. J. Minney—Midst Himalayan Mists—1923

কার্সিয়ঙে শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৮৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমরা সমাজের চারিজন প্রচারক, অর্থাৎ নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শশিভূষণ বসু ও আমি, এই সঙ্কল্প করিলাম যে, আমরা হিমালয় পাহাড়ে কিছুদিন নির্জনে বাস করিব। তৎসঙ্গে এই সঙ্কল্প করা হইল যে কাহারও নিকটে সাহায্য ভিক্ষা করা হইবে না। আলোচনার পর স্থির হইল যে আমরা খার্সিয়াঙ্গে গিয়া থাকিব। দার্জিলিং বহু কোলাহলময়, ততদূর যাওয়া হইবেনা। তদনুসারে আমরা খার্সিয়াঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একটি ঝুলি করিয়া তাহাতে যাহার যাহা দিবার মতো ছিল ফেলিয়া দিলাম। সেই ঝুলিটি বন্ধুবর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের হস্তে রহিল। তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের নিকট ফ্রী পাস পাইয়া খার্সিয়াঙ্গে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সাধন ভজনে বসিলাম। একটি চাকর রাখিলাম সে বাসন মাজিত, ঘর ঝাঁট দিত, ও অপরাপর কাজ করিত। নবদ্বীপবাবু বাজার করিবার ভার লইলেন। শশী বিছানা তোলা ও ডাকঘরে যাওয়ার ভার লইলেন, বিদ্যারত্ন ভায়া থাওয়া ও লোকের সঙ্গে দেখা করার ভার লইলেন; আমি রন্ধনের ভার লইলাম। আমরা প্রত্যূষে উঠিয়া সমবেত উপাসনা করিতাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ ও উপাসনা করিয়া যে যে-দিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতাম। এইরূপে দুই ঘণ্টা কাল প্রত্যেকে একান্তে যাপন করিতাম। সেই সময়টা প্রত্যেকে নিজ-নিজ অভীষ্ট প্রণালীতে চিন্তা ধ্যান উপাসনাদি করিতাম। আমাকে রন্ধনের জন্য সকলের অগ্রে ফিরিতে হইত।

আমি বাড়ির অনতিদূরে পাহাড়ের উপর নির্ঝরের পার্শের একখানি প্রস্তরের উপরে আসন নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রতিদিন বসিয়া চিন্তা ধ্যান উপাসনা করিতাম। এক মাস এই রূপ সাধন করিয়া প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ছিলাম। এমনকি, এখনো দার্জিলিং যাইবার সময় সেই পাথর খানির উপর যখনি দৃষ্টি পড়ে, তখনি মনে উপাসনার ভাব উপস্থিত হয়। সেই সাধনের ফল চিরদিন রহিয়াছে। এখানে বাস কালে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ অনেকে দার্জিলিং যাইতে আসিতে আমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য অর্থাদি দিয়া যাইতেন।

এইরূপে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর, আমরা একদিন উপাসনান্তে স্থির করিলাম যে নামিয়া যাইব। তখন কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের অর্থের ঝুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে ফিরিতে যে ব্যয় হইবে তাহার এগারোটি টাকার অপ্রতুল; ভৃত্যকে বেতন দিতে হইবে, এবং বাড়ি ভাড়া দিতে হইবে, ইত্যাদি। আমি প্রস্তাব করিলাম, ভিক্ষা করা হইবে না; ভৃত্যকে আমার গায়ের মোটা কম্বল দেওয়া হইবে, ল্যাম্পটি বিক্রয় করা যাইবে, ইত্যাদি। তদনুসারে ল্যাম্পটি বিক্রয় করা গেল। আমি ভৃত্যের নিকট বেতনের প্রাপ্য অংশ স্বরূপ কম্বল দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম, সে শুনিয়া হাসিতে লাগিল। আমরা যে এত দরিদ্র যে গায়ের কম্বল দিয়া ভৃত্যের বেতন দিতে হয়, এ কথা সে বিশ্বাস করিতে পারিলনা।

অবশেষে কি করা যায়? আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির নিয়ম লঙ্ঘণ করিয়া ভিক্ষা করাই স্থির হইল। আমি একজন ব্রাহ্ম বন্ধুর নিকট ভিক্ষা করিবার জন্য চিঠি লিখিতে বসিলাম, এবং আমার দেখাদেখি বিদ্যারত্ন ভায়া দার্জিলিঙের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু পার্বতী চরণ রায়কে পত্র লিখিতে বসিলেন। দুই-চারিটি পংক্তি লিখিয়াই আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল; নিয়মটা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করিলামনা। সুতরাং যে কয় পংক্তি লিখিয়াছিলাম, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। আমি পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম দেখিয়া বিদ্যারত্ন ভায়াও অর্ধলিখিত পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

সেই দিনেই দার্জিলিং হইতে অ্যামেরিকান ইউরোপিয়ান মিশনারি সি. এইচ এ ড্যাল সাহেবের এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পরশু নামিয়া যাইতেছি, তুমি কবে নামিবে? তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে, যদি সেই দিন যাও, একসঙ্গে যাইতে পারি এবং সে কথাটা বলি।" আমি উত্তরে লিখিলাম, "আমাদের হাতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া দিবার পয়সা নাই, আমরা বোধ হয় হাঁটিয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাইব।"

তৎপর দিন এক আশ্চর্য ঘটনা! ডাকযোগে কলিকাতা হইতে এক পত্র আসিল। খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে দশ টাকার কারেন্সি নোট; প্রেরকের নাম নাই, কেবল এইমাত্র লেখা—"আপনাদের খরচের জন্য!" কি আশ্চর্য! তখন আমরা দশ টাকার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিলাম, ঠিক সেই দশটা

টাকাই আসিয়া উপস্থিত ! আমরা তখনই দেনাপত্র শোধ করিয়া দার্জিলিং মেইলে শিলিগুড়ি নামা স্থির করিলাম। **শিবনাথ শাস্ত্রী** (আত্মপরিচয়)

For natural beauty, Darjeeling is merely unsurpassed in the world. From all countries travellers come there to see the famous view of Kanchenjunga 28, 150 in height, and only 40 miles distant.—**Sir F. young husband.**

The view of the Himalayas from the hill-station of Darjeeling is world-renowned. It includes valleys little over sea-level and a summit 28, 150' high. Kanchanjunga is fifty miles distant and the angle of sight is only a degree or two, yet it seems immeasurably high and forms a splendid centrepiece to a host of giant peaks that project like spurs of foam—crested reef above waves of blue foothills. **—F. S. Smythe, Mountaineer**

কালিমপং-এর হাটে
কুকরি দিয়ে কাটে
মাছ
তিস্তাবাজার ছাড়িয়ে
বাতাস ছোটে নাড়িয়ে
গাছ
গাছের মাথা, আলিমপন
ভুঁই জোড়া তোর, কালিমপং
নাচ
মেঘের ঘাঘর জড়িয়ে
বরষাকুচি সরিয়ে
আঁচ
দেখাস রোদের রাগের টং
ধন্যি মেয়ে কালিমপং

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কখনো বা কোনোদিন
এই হৃজবজ হা-পিত্যেশ গা-গতর নিয়ে
বড়ো জোর টাল-মাটাল ঢঙে মই নিয়ে কিংবা মই বেয়ে
উঠেছি শূন্যে গোলায় পণ্ডশ্রম—উচ্চাশার

আর সদুঃখে শুনেছি পয়মন্ত ধুরন্ধর মানুষেরা
নতমস্তক বিন্ধ্যাচল, নীলগিরি, দুর্জয় লিঙ্গ অবহেলে পার হয়
পূজাবকাশে হাওয়া বদলের উল্লম্ফন উল্লাসে!
প্রকৃতপক্ষে পঙ্গু না হয়েও পর্বত লঙ্ঘন নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যাই হোক, আকাশ চত্বরে নয়, মনে হয়
মর্তে যেন সাত-রঙা মেঘ করে আছে, যেন নব মেঘদূত
আদিগর্ভ পরিব্যাপ্ত, আমি একালের অপাঙক্তেয় এক মসীজীবী
এক বিরহী যক্ষের হৃদয়, দৃশ্যের পিপাসায় অনাহারী:
মেঘগুলি নীল, ভস্মবর্ণ, ধূসর, পিঙ্গল
অচল অটল স্থৈর্য মূর্তি, জমাট রহস্যাবৃত
সপার্ষদ ধূর্জটির ধ্যানের বিকল্প
ঈশ্বরের নিজস্ব হাতের উত্থান পতনময় রূপজ স্থাপত্য কলা
দুই চক্ষু এবং কল্পনার উচ্চাঙ্গ পরিধি ব্যাপ্ত
পিপাসার কি অনির্বচন চরিতার্থতাময় ফুটে আছে
ভুটানের এই অনিঃশেষ পার্বত্য প্রদেশ
এরা কি আমার মত অক্ষমের ধেয়ানে
অদেখা পার্বতীর অর্ধশায়িত রূপসী শরীর,
কিংবা এরা কি আমার জন্মান্তরের পরিত্যক্ত স্বপ্নশ্রেণী, অপ্সরীর
নৃত্যের জমাট স্তব্ধতা?
জানিনা প্রেমিকা সাগরের ভূলুণ্ঠিতা ক্ষমা ভিক্ষা কিনা
ঈশ্বরের দাম্ভিক পদতলে?

এই সব সাতপাঁচ ভাবি আর কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় ঘটে।
অশ্লীল কটাক্ষ ছিঁড়ে খসে পড়ে অকস্মাৎ ॥

—**সুনীল বসু** (উচ্চাশার উত্তুঙ্গ পাথরে একজন)

এর মধ্যে পুপে দিদি গেছে দার্জিলিঙে। সে রইল মাথা ঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

সে বললে, পুরুষ মানুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজন ভারি নিন্দে করছে। —**রবীন্দ্রনাথ** (সে)

দীনবন্ধু দাদামশাই বললেন, পুজোর ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন ?
জবাব দিলাম, দার্জিলিং।

—কেমন লাগল ?

—বিশ্রী।

—বিশ্রী কেন ? শুনেছি সে এক আশ্চর্য জায়গা। পাহাড়, মেঘ, পাইনের বন, পাগলা ঘোড়া, ম্যাল্ রোড, জলাপাহাড়, বার্চ হিল, ভিক্টোরিয়া ফলস, লেবং—টাইগার হিলে সূর্য ওঠা—

আমি বললাম, সব বাজে। কন্‌কনে শীত, বিশ্রী বিষ্টি, পাহাড় ভাঙতে দম আটকাবার উপক্রম, আর সব চাইতে বিশ্রী কলকাতার নকল স্নবারি, ম্যালের বেঞ্চিতে দল বেঁধে হাঁ করে বসে স্বাস্থ্যলাভের করুণ-চেষ্টা—

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—(নৈশপর্ব)

Hooray ! the most magnificient place I have seen since leaving China ! Wonderful mountains, fascinating natives in furs and pigtails. Hordes of Lepchas, Bhutias, Nepalese ; and, best of all, real Thibetans, loaded with silver and turquoise ornaments !

Letters of Gilbert Little Stark—1907

We are glad to hear that it has been determined to establish a station at Darjeeling, and that Colonel Lloyed has been authorised to commence the coustruction ot a road from the hills to the plains without delay.

Calcutta Courier—December 1837

মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির ;
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতর শূন্যের মহিমা।
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে
নিশ্চল সবুজ বন্যা, নিবিড় নিঃশব্দে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয় ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্ব জীবনের
সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণীর আদিম সূচনায়।

....

গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে।
পার্বতী জনতা
বিদেশী প্রাণ যাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে,
রেখা রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,

কর্মের দৈত্য সে কনে
প্রহরে প্রহরে।···

—রবীন্দ্রনাথ (জন্মদিনে)

কুজ্ঝটিকাজাল যেই
সরে গেল মংপু-র
নীল শৈলের গায়ে
দেখা দিল রঙপুর।
বহুকেলে জাদুকর, খেলা বহুদিন তার,
আর কোনো দায় নেই, লেশ নেই চিন্তার।
দূর বৎসর-পানে ধ্যানে চাই যদ্দূর
দেখি লুকোচুরি খেলে মেঘ আর রোদ্দুর।
কত রাজা এল গেল, ম'ল এরই মধ্যে,
লড়েছিল বীর, কবি লিখেছিল পদ্যে।
কত মাথা ফাটাফাটি সভ্যে অসভ্যে
কত মাথা কাটাকাটি সনাতনে নব্যে।
ঐ গাছ চিরদিন যেন শিশু মস্ত,
সূর্য-উদয় দেখে, দেখে তার অস্ত।
ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরই 'পরে জপ করে সন্ধ্যা।
নিচে রেখা দেখা যায় ঐ নদী তিস্তার,
কঠোরের স্বপ্নে ও মধুরের বিস্তার।

—রবীন্দ্রনাথ (মংপু পাহাড়ে)

[...]থী যখন পাহাড়ে ওঠার প্রস্তাব তুললে তখন সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারলুম না। এখানে সময়টা ভালো। মাঝে মাঝে মেঘগুলো এসে শিখরে শিখরে আড্ডা জমায় কিন্তু অত্যন্ত সাত্ত্বিক শুভ্র ভাবে—

রবীন্দ্রনাথ (ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি)

In this land of Himalayan happiness, almost-everyone is grinning or smiling.······this little girl, despite the bending weight of her burden was laughing, always laughing···

R. J. Minney/Midst Himalayan Mist—1920

Carrying Cappacity of Hillmen

As an instance of the extraordinary carrying capabilities of these hillmen the following is recorded. A Bhutia navy in 19:2 was seen by the writer carrying a bale of cloth weighing 4 mds 8 srs. from the railway goods shed to Commercial Row on a very rainy day when a slip meant dislocation of neck and itstantaneous death.

—Darjeeling Past and Present— 922

···রং-এর আর আলোর ঢেউ বয়ে গেল চারদিকে। আর সেই গাছপালার ফ্রেমে আঁটা কাঞ্চনজঙ্ঘার স্থির চিত্র কথা কয়ে উঠল কল্‌কল্‌ করে। দুজনে চুপটি করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলুম, যতক্ষণ না সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেল আকাশে। দাদামশায় (অবনীন্দ্রনাথ) বললেন—রোজ এমনটি হয় না। কুয়াশা থাকলেই মুশকিল।

—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (দক্ষিণের বারান্দায়)

···আসল কথা কিন্তু "ভারতবর্ষ"কে নিয়ে। দাদার (জলধর সেন) সঙ্গে কতকটা কথাবার্তা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে কোনো মীমাংসা হল না; একে ত এবার দারজিলিং থেকে আসার পরে তাঁর কানের এতটা উন্নতি হয়েছে যে, বলশালী লোকেও দু-চারটে কথার পর হাঁপিয়ে ওঠে।···

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ১৯১৮)

(দার্জিলিং-এ) রাত্রিবেলা দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে সুখ দুঃখের কথা বলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁর পারিবারিক অশান্তির কথা বলেন। দাদা মন দিয়ে শোনেন, ভায়ের দুঃখে দুঃখিত হন, সান্ত্বনা দেন।

"অতুল (অতুলপ্রসাদ সেন) আমার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত। নীরবতার মধ্যেই তাহার প্রাণের বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারিতাম। সেও আমার সহানুভূতির স্পর্শ বুঝিতে পারিত। এরূপ সমবেদনায় আমরা কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। সেবারেই অতুল তার সেই গানটি রচনা করে—

যাবনা, যাবনা, যাবনা ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।
বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক—ভরে।

সত্যপ্রসাদ সেনের ডায়েরি থেকে মানসী মুখোপাধ্যায়-এর
অতুলপ্রসাদ

It has a most agreeable climate, particularly suited to Europeans, and the temperature seldom exceeds 70° in summer or falls below 35° in winter. The mean temperature of the station is 56° and the average rainfall is 120 inches. **Newman's Guide Book—1922**

কথিত আছে যে এই সুরঙ্গ পথে (মহাকালের মন্দিরের কাছে) নাকি মহাদেব কুচনী পাড়ায় অর্থাৎ কুচবিহারে বিহার করিতে যাইতেন। স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসীরা বলেন যে পর্বত শীর্ষস্থ গহ্বরটি সুরঙ্গ পথে তিব্বতের প্রধান শহরে লাসা, ও কুচবিহারের সহিত সংযুক্ত আছে, কিন্তু কোনো নরদেহ ধারী জীব সে পথে গমনাগমন করিতে সক্ষম নহেন।

—নলিনী মজুমদার—১৯৩০

Hot springs are known to exist in Independent Sikkim, but the only indication in the Darjeeling district that I

could hear of, was at the Mangphu copper mines on the Tista. .... The mineral spring about three miles east of Darjeeling is well known, and was formerly utilized for medicinal purposes, a convalescent depot having been built near it for the convenience of the troops stationed at Jallapahar. The water, however, is not used at present, and the depot has gone to ruin. It was also used by the hill-men for rheumatism and cutaneous diseases.....

Memoirs of the Geological Survey of India Vol XI--1875

তাকদা চা বাগানের অদূরে একটি "মিনারেল স্প্রিং" আছে। পাহাড়িয়ারা ইহাকে "দাওয়াই পানি" বলে। **—নলিনীকান্ত মজুমদার—১৯৩০**

ট্রেনখানি সেই বনের ভিতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কেন্নোর মতে এঁকে বেঁকে চলে। **—উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী**

যত উপরে উঠছি তত অদ্ভুত লাগছে, এবং দেখছি সবার গায়েই শীতের পোশাক।·· দার্জিলিঙের সমস্ত সুন্দর লাগল। এরকম উন্মাদ করা সৌন্দর্য আর আমি দেখিনি। দার্জিলিঙ-এর দৃশ্য-বৈচিত্র্য, শত রকমের অভিনবত্ব আমাকে অভিভূত করে ফেলল। যা ছিল এতদিনের কল্পনা, যার জন্য অন্তরে অন্তরে আমি এমন টান অনুভব করেছি, তা যে এমন আশ্চর্য সুন্দর, তা যে ভাষার অনেক উর্ধে একটি অর্ধচেতন সত্তার শুধু স্পন্দনময় একটি আনন্দ আবেগ, তা আগে কল্পনা করতে পারিনি।

—পরিমল গোস্বামী (স্মৃতি-চিত্রন)

Troubles with the adjacent States mark the early history of Darjeeling, but by 1866 it had settled down to peace and uninterrupted progress and had been linked by roads with the outside world......

—From the Hooghly to the Himalayas

প্রমথ, দার্জিলিংকে তুমি যে রকম নিভৃত এবং নিরাপদ বলে বর্ণনা করেছে তাতে আমার খুবই লোভ হচ্চে।...

—রবীন্দ্রনাথ (প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠি)

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ দাদামশার গলা শোনা গেল—দেখে যা দেখে যা! ওরে মোহনলাল কোথায় গেল, ডাক ডাক! আমরা সবাই কাঁচের ঘরে বসেছিলুম, কেউ বই নিয়ে, কেউ অর্ধ নিদ্রার কোলে। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলুম। দাদামশায় বললেন—চোখ লাগিয়ে দেখ। একেবারে রবিকাকার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। দূরবীনে চোখ দিয়ে দেখি বরফ আর বরফ। দাদামশায় বললেন—দেখতে পাচ্ছিস না? —শুধু তো বরফ দেখছি। —দেখি। আবার নড়াসনি টেলিস্কোপটাকে। বলে নিজে চোখ দিলেন। —ঐ তো ছোট্ট একটি ঝরণা। দেখ ভাল করে। ঝুর ঝুর করে জল পড়ছে।

...দাদামশায় বললেন—দেখছিলুম বসে বসে পাহাড়ের দৃশ্য। বরফের দিকে টেলিস্কোপটাকে ঘুরিয়ে দেখছি হঠাৎ মনে হল কি একটা নড়ছে। বরফের উপর কোন প্রকাণ্ড জন্তু না কি—তাই মনে হল। তারপর দেখলুম একটা মস্ত বরফের ধস্ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল। তার সঙ্গে তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল ঐ নদীটা।...

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (দক্ষিণের বারান্দায়)

.. অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী, গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যান মগ্ন পৃথিবী, নীলাম্বরশির অতন্দ্ররঙ্গে কলমন্দ্র মুখরা পৃথিবী, অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।

—রবীন্দ্রনাথ (পত্রপুট)

এখানে বাজারে ফুলকফি যথেষ্ট আছে, কমলালেবুর আমদানি এখনো শুরু হয়নি—চেষ্টা করলে আম পাওয়া যায়।…এখানে শাক সব্জীর অভাব নেই। এ বৎসর এখানে শীতটা আশাতীত, মাঝে মাঝে শিলবৃষ্টির সহায়তায় তার স্পর্ধা বেড়ে উঠছে। রৌদ্র বিরলদর্শন, ঘন সজল মেঘে আস্তীর্ণ আকাশের প্রাঙ্গন।—

রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৩ মে। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা

The hill portion of the District is a confused labyrinth of ridges and narrow valleys. There are no open valleys, no plains, no lakes and no precipices of consequence. Most of the ridges are forest clad though on lower slopes the forests have often been cleared for tea and other cultivation.

Gazetteer of the Darjeeling District—1947

The scenery along the banks of the Tista is extremely beautiful. The gorge is narrow and winding and the steep sides are clothed in dense forest broken at intervals by side valleys. Up the gorge and the side valleys can occasionally be obtained glimpses of the high mountain masses: near at hand the vegetation and insect life is gorgeous in tropical splendour.

Gazetteer of the Darjeeling District—1947

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত স-র উচ্ছ্বাস-উক্তি! 'ওমা' 'কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'—কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'র-দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং স—দুঃখ কচ্ছে যে র দেখতে পেলেনা।

—রবীন্দ্রনাথ (ছিন্নপত্র)

তারপরে শীতটিও ক্রমে জেঁকে উঠতে থাকে, তখন আর বুঝতে বাকি থাকেনা যে এবারে এক নতুন রাজ্যে আসা গেছে ; তার নতুন রকমের হাওয়া, নতুন রকমের শোভা ; সেখানে নতুন ধরনের মানুষ, নতুনতর মেঘের খেলা। —**উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী**

…তার আগে ছিলাম কার্সিয়ঙের কাছে একটা চা বাগানে, বাবা যেখানে চাকরী করতেন।…এখানে আসবার আগে অত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কনকনে শীত, দূর বরফে ঢাকা বড়বড় পাহাড়—পর্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি।—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহাসমারোহের সঙ্গে দার্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আদিত্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই।— **রবীন্দ্রনাথ** (জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠি)

From Salt Hill Road (opposite the Union Chapel) to the Depot at Jalapahar, which was circumscribed up to the close of 1870, the hillside was covered by such dense forest and heavy undergrowth of maling bamboo that tigers abounded therein, one of which as late as 1860 killed a grass cutter on the spot on which 'Bagmarie' stands (e i the place where a tiger had killed) on Auckland Road. About the year 1840 the occurrence of a fire, which swept the hillside, from Salt Hill right up to the spot on which the Depot now stands, of every vestige of vegetation, gave Jalapahar, the 'burnt hill', its name.

Darjeeling Old and New (1923)

Snow is occasionally experienced in winter months, but heavy falls are exceptional.

Newman's Guide to Darjeeling 1922

দার্জিলিং বাসিনী পার্বত্য সুন্দরীদের মুখে এ গান প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় :

আবো ত মালুম ভয়ো, কাঞ্চী,
ম ত যান্থু পর পরদেশ
ত্রিবেণী সেলাম"।

তিস্তা ব্রিজের প্রায় এক মাইল উত্তরে রঙ্গীত ও তিস্তা নদীর সঙ্গমস্থল "ত্রিবেণী" নামক তীর্থে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে এক পক্ষব্যাপী এক বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। এখানে···প্রতি বৎসর কত যুবক যুবতী পার্বত্য জাতির চির সনাতন প্রথা অনুসারে প্রেমের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

নলিনা মজুমদার ১৯৩০

কলকাতা আমার জন্মস্থান কিন্তু আমার আবাস্থ নয়। শরৎকালে আর্দ্র দুঃসহ হয়ে উঠছে-যত শীঘ্র পারি গিরিশৃঙ্গে আশ্রয় নেব৮···

রবীন্দ্রনাথ (বাসন্তী দেবী ও নিখিলচন্দ্র বাগচীকে লেখা—আগস্ট ১৯৩৯)

দ্বিতীয় চোট হাঁটতে বেরুতেন সকালের খাওয়ার পরেই। অত বড় শিল্পী দার্জিলিং-এ এসেছেন, বনের শোভা, পাহাড়ের শোভা, মেঘের দৃশ্য দেখে বেড়াবেন, পাখির গান শুনবেন, এই বোধ হয় হওয়া উচিত, কিন্তু দাদামশায় ঘুরতেন বাজারে আর গলিতে। দোকান দেখতেন, পাহাড়ীদের ঘর দেখতেন, তাদের সঙ্গে কথা কইতেন মাঝে মাঝে। মানুষের বসতি যেখানে, সেখানেই ঘোরাফেরা করতেন বেশী।

—**মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়** (দক্ষিণের বারান্দা)

১৯

There are about a dozen species of pigeon and dove, some being found only in high elevations. One found in the plains is the Bengal green pigeon. In the hills the Kokla green pigeon are common. The melodious call of the former may be heard even in Darjeeling.

—The District Gazetteer of Darjeeling—1947

…খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা
যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার
জরুরি দরকার
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে
গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।

রবীন্দ্রনাথ (ক্যামেলিয়া)

…and the visitor to Darjeeling will do well to ride out early to Tiger Hill, or walk to the more accessible observatory Hill in time to see the sunrise. From nowhere can the pagentry of the arrival and departure of day be better seen than from the latter Hill on a winter day, and no pen has yet described the full glory of that changing scene when—

From grey of dusk the veils unfold
To pearl and amethyst and gold
Thus is the new day woven and spun :
From glory of blue to rainbow spray
From sunset-gold to violet-grey
Thus is the restful night re-own

From the Hooghly to the Himalaya (1913)

দুপুরে এক পশলা হয়ে গেছে, আবার কখন হয় বলা যায়না, তাই রেন কোটটা গায়ে দিয়েই বেরিয়েছি। দার্জিলিঙের সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে নিরিবিলি রাস্তা জলাপাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা মোড়ের মাথায় একটি ভদ্রলোক...

সত্যজিৎ রায় (বাতিকবাবু)

...এদিকে আবার মেঘ করে এসেছে। অমি দ্রুত পা চালিয়ে আমার হোটেলে চলে এলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝলমলে সকালটা এক নিমেষে একটা সুদূর অতীতের ঘটনায় পরিণত হল। ...

সত্যজিৎ রায় (বাতিকবাবু)

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি।
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছে ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার সঙ্গে কুসুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ভুলের ভাষার
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্তভেরী!

মর্মর কঠিন-শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্ব রাগে লিপ্ত তব কর পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে।

দারজিলিং (১৯১৯) প্রমথ চৌধুরী

সকলেই নেমে যায় নীচে বিখ্যাত পাকদণ্ডী রেলপথ বেয়ে
শীতের মেঘলা দিনে ছেড়ে দারজিলিং
কোলাহল শান্ত, শুধু গোম্ফার ডং ডিং ঘণ্টাধ্বনি বাজে
আর তুহিন বাতাসে ভাসে তুষার ও হিম, সুরেখা
আমি ও নিখিল শুধু রহে গেছি মুনলাইট গ্রোভে
স্টোভে শুধু কেটলির শোঁ শোঁ শব্দ ..

পার্বতী রুক্ষ রক্তবাস আপনার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে কঙ্কালিনী বেশে দেখা দিয়েছেন। অনেক দূরের একটা পাহাড়; তার গায়ে একটি একটি গাছ দ্বিপ্রহরে চাকা-চাকা কালো দাগ ফেলেছে, যেন প্রকাণ্ড একখানা বাঘছাল রৌদ্রে বিছানো—এরই উপরে চির তুষারের ধবল মূর্তি সারাদিন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটির পর একটি গিরিচূড়া হিমে সাদা ক'রে দিয়ে শীত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি। পর্বতে পর্বতে মানুষের জ্বালানো দীপমালা থেকে দু-দশটা করে আলোর ফুলকি প্রতিদিনই দেখছি খসে পড়ছে; এখানকার হাট ভাঙবার পালা শুরু হয়েছে; পূজোর ছুটির যাত্রীরা দলে দলে ঘোড়াতে গাড়িতে ক্রমে পর্বত খালি ক'রে দিয়ে নেমে চলেছে। **—অবনীন্দ্রনাথ** (পথে বিপথে)

দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠলে মেঘের সঙ্গে দেখা হয়।··· ক্রমে হয়তো ট্রেন তার ভিতরে ঢুকে যায়। তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে আমরা যাকে কুয়াশা বলি এ ঠিক সেই জিনিস। দূরে থেকে তাকে দেখলেই সে মেঘ, আর ভিতরে ঢুকে দেখলেই সে কুয়াশা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

Sanskrit is the speech of the Gods—and the Himalaya is the abode of the Gods; it would seem only natural for Hindu and specially for a cultural Hindu, that the names of the peaks of the Himalayas are from Sanskrit If the

word cannot be proved to be from Sanskrit and it is really Tibetan (as the evidence seems to prove it conclusively), then there is not much point in pressing for a compromise spelling on a Sanskrit basis... **Suniti Kumar Chatterjee**

অবশেষে দেবাত্মা নাগাধিরাজের শরণ নিয়েছি। নিরেনব্বই এর ধাক্কাটা এখানে এসে কেটেচে। ঘোরতর কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেছে—কুঁড়েমির স্বর্গে আছি বললেই হয়—এমন কি ছবি আঁকার দুর্নিবার নেশাও আমাকে নাগাল পাচ্চে না।

রবীন্দ্রনাথ (হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১)

The sun we cursed, so oft below,
But makes Darjeeling glad ;
Dispelled is gloom ; with bud and bloom
The mountain sides are clad.

The birds we heard in by-gone years,
Sing for us in the trees,
And violets rise, with purple eyes,
To greet the gentle breeze. [etc.]

—The Darjeeling Advertiser, 1917

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি পিছে গিয়ে উঠিছে নামিছে বারে বারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষার নিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনা বিহীন।
সেদিন বৈশাখ মাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্র স্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল ;—মেঘের কোমল ছায়া তারি' পরে

যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নিচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালবেসে।

রবীন্দ্রনাথ (বনবাণী

দার্জিলিঙে দেখা দিল একটি রহস্য প্রশ্নরূপে। হঠাৎ সব নতুন, সমতল মাটি নেই, দিগন্তরেখা নেই, গ্রীষ্মের দাহ নেই, দৃশ্যের একঘেয়েমি নেই সব অনিয়মিত, সব অস্থির। ঊর্ধ্বে মেঘ, পায়ের কাছে মেঘ, পায়ের নিচে মেঘ। আকাশে মানুষ, পাতালে মানুষ। মনের যে কি অবস্থা তা বোঝানোর ভাষা নেই। **—পরিমল গোস্বামী** (স্মৃতিচিত্রণ)

পথের ধারে বিশাল বড়-বড় সব গাছ, তাতে নানা রঙের ফুলও আছে কোনো কোনোটাকে প্রকাণ্ড লতার জালে জড়িয়ে রেখেছে, কোনো কোনোটার গায়ে লম্বা-লম্বা দাড়ির মতো শ্যাওলা ঝুলছে। নীচের দিকে তাকাই—উঃ! কি ঘন বন! পাহাড়ের গা ঢেকে দিনকে রাত করে রেখেছে। যদি গাড়ি থেকে পড়ে যাই, তাহলে অমনি বনের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে কোথায় চলে যাব। উপরের দিকে তাকাই—বাবা! কি উঁচু সব গাছ! জাহাজের মাস্তলের মতো সোজাসুজি সেই কোথায় উঠে গিয়েছে। **—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী**

এই যে কটা ঋতুর মধ্যে দিয়ে শীতের আগে পর্যন্ত এই পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ পাখি এল, বাসা বাঁধলে, সংসার পাতলে, বাস করলে, আবার চলে গেল দূর দূরান্তরে, আকাশ পথে দলে দলে—কী সুন্দর, কী স্বাধীন এদের গতিবিধি। **অবনীন্দ্রনাথ** (পথে বিপথে)